হুমায়ূন আহমেদ

হোটেল গ্রেভার ইন

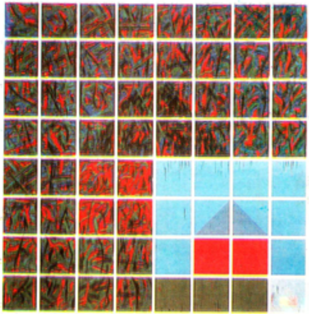

হোটেল গ্রেভার ইন

হুমায়ূন আহমেদ

কাকলী প্রকাশনী

©
মেহের আফরোজ শাওন

অষ্টম মুদ্রণ
অক্টোবর ২০১১
সপ্তম মুদ্রণ
ডিসেম্বর ২০০৬
প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৮৯

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ওবায়দুল ইসলাম

কম্পোজ
কাকলী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা-১১০০

দাম ১০০ টাকা

ISBN 984 70133 0009 8

উৎসর্গ

আবারো গুলতেকিনকে

একটি অপ্রয়োজনীয় ভূমিকা

হোটেল গ্রেভার ইন-এর প্রথম সংস্করণে কোন ভূমিকা ছিল না। ভেবেছিলাম, ভূমিকার প্রয়োজন নেই — পাঠক বুঝতে পারবেন যে হোটেল গ্রেভার ইন-এর গল্পগুলি আসলে বানানো গল্প নয় — স্মৃতিকথা। আমার মনে হয় সবাই তা বুঝতে পেরেছেন, তবু কেন জানি অসংখ্যবার আমাকে বলতে হয়েছে — না, এগুলি বানানো গল্প নয়। এবার ভূমিকাতেই লিখে দিলাম। আমার তুচ্ছ স্মৃতিকথা যে পাঠকদের এত ভাল লাগবে তা আগে বুঝতে পারি নি। আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো — এ আলো আমি কোথায় রাখব?

হুমায়ূন আহমেদ
২-২-৯০
শহীদুল্লাহ হল

"খুলে দাও বরফের আল্পনা আঁকা
হোটেলের সমস্ত জানালা।
খুলে দাও আমার পোশাক
আমাকে আবৃত করে আজ শুধু বরফ ঝরুক
সারাদিন... সারাদিন।
আজ শুধু বরফের সাথে খেলা।"
[জীবনের প্রথম বরফ : নির্মলেন্দু গুণ]

হোটেল গ্রেভার ইন ৯
ডানবার হলের জীবন ২১
বাংলাদেশ নাইট ২৬
কিসিং বুথ ৩১
প্রথম তুষারপাত ৩৫
জননী ৩৮
এই পরবাসে ৪৪
ম্যারাথন কিস ৫৩
লাস ভেগাস ৫৬
শীলার জন্ম ৬২
পাখি ৬৬
ক্যাম্পে ৭০
নামে কিবা আসে যায় ৭৬

হোটেল গ্রেভার ইন

এলেম নতুন দেশে। লরা ইঙ্গেলস ওয়াইল্ডারের প্রেইরী ভূমি, ডাকোটা রাজ্য। ভোর চারটায় পৌঁছলাম, বাইরে অন্ধকার, সূর্য এখনো ওঠেনি, হেক্টর এয়ারপোর্টের খোলামাঠে হু-হু করে হাওয়া বইছে। শীতে গা কাঁপছে। যদিও শীত লাগার কথা নয়। এখন হচ্ছে—ফল, শীত আসতে দেরি আছে।

আমার মন খুব খারাপ।

দেশ ছেড়ে দীর্ঘদিনের জন্যে বাইরে যাবার উৎসাহ আমি কখনো বোধ করিনি। বর্ষাকালে বৃষ্টির শব্দ শুনবো না, ব্যাঙের ডাক শুনবো না, চৈত্র মাসের রাতে খোলা ছাদে পাটি পেতে বসবো না, শীতের দিনে গ্রামের বাড়িতে আগুনের কাছে হাত মেলে ধরবো না, এটা হতে পারে না।

অনেকের পায়ের নিচে সর্ষে থাকে। তাঁরা বেড়াতে ভালোবাসেন। বিদেশের নামে তাঁদের রক্তে বাজনা বেজে ওঠে। আমার কাছে ভ্রমণের চেয়ে ভ্রমণকাহিনী ভালো লাগে। একটা বই হাতে, নিজের ঘরে নিজের চেনা জায়গাটায় বসে থাকবো, পাশে থাকবে চায়ের পেয়ালা, অথচ আমি লেখকের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লেখক হয়তো সুন্দর একটা হ্রদের বর্ণনা দিচ্ছেন, আমি কল্পনায় সেই হ্রদ দেখছি। সেই হ্রদের জল নীল। জলে মেঘের ছায়া পড়েছে। আমার কল্পনাশক্তি ভালো। লেখক তাঁর চোখে যা দেখছেন আমি আমার কল্পনার চোখে তাঁর চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি। কাজেই কষ্ট করে যাযাবরের মতো দেশ-বিদেশ দেখার প্রয়োজন কি?

প্রেইরী ভূমি সম্পর্কে আমি ভালো জানি। লরা ইঙ্গেলস-এর প্রতিটি বই আমার অনেকবার করে পড়া । নিজের চোখে এই দেশ দেখার কোন আগ্রহ আমার নেই । আমি এসেছি পড়াশোনা করতে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রির মতো রসকষহীন একটি বিষয়ে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী নিতে হবে। কতো দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কেটে যাবে। ল্যাবরেটরিতে, পাঠ্য বইয়ের গোলকধাঁধায়। মনে হলেই হৃৎপিণ্ডের টিক্‌টিক্‌ খানিকটা হলেও শ্লথ হয়ে যায়। হেক্টর এয়ারপোর্টের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার মতো বুকের ভেতরটাও হু-হু করে।

মন খারাপ হবার আমার আরেকটি বড় কারণও আছে। দেশে সতেরো বছর

বয়সী আমার স্ত্রীকে ফেলে এসেছি। তার শরীরে আমাদের প্রথম সন্তান। ভালোবাসাবাসির প্রথম পুষ্প। ঢাকা এয়ারপোর্টে আরো অনেকের সঙ্গে সে-ও এসেছিলো। সারাক্ষণই সে একটু দূরে-দূরে সরে রইলো । এই বয়সেই সন্তান ধারণের লজ্জায় সে ম্রিয়মাণ। কালো একটা চাদরে শরীরটা ঢেকেঢুকে রাখার চেষ্টাতেই তার সময় কেটে যাচ্ছে। বিদায়ের আগ মুহূর্তে সে বললো, আমাদের প্রথম বাচ্চার জন্মের সময় তুমি পাশে থাকবে না?

আমার চোখে প্রায় পানি এসে যাবার মতো অবস্থা হলো। ইচ্ছে করলো টিকিট এবং পাসপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে তার হাত ধরে বলি—চলো, বাসায় যাই।

অল্প কিছুদিন আমাদের আয়ু। এই অল্পদিনের জন্যে আমাদের কতো আয়োজন—পাস, ডিগ্রী, চাকরি, প্রমোশন, টাকা-পয়সা, বাড়িঘর—কোনো মানে হয়? কোনোই মানে হয় না।

আমার মনের অবস্থা সে টের পেলো। মুহূর্তের মধ্যে কথা ঘুরিয়ে বললো, যদি ছেলে হয় নাম রাখবো আমি। আর যদি মেয়ে হয় নাম রাখবে তুমি। কেমন?

প্লেনে আসতে-আসতে সারাক্ষণ আমি আমার মেয়ের নাম ভেবেছি। কতো লক্ষ লক্ষ নাম পৃথিবীতে, কিন্তু কোনোটিই আমার মনে ধরছে না। কোনোটিই যেন মায়ের গর্ভে ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্যার উপযুক্ত নাম নয়। এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নামটি আমাকে আমার মেয়ের জন্য খুঁজে বের করতে হবে। আজ থেকে আঠারো, উনিশ বা কুড়ি বছর পর কোনো-এক প্রেমিক পুরুষ এই নামে আমার মেয়েকে ডাকবে। ভালোবাসার কতো না গল্প সে করবে। হেক্টর এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে এইসব ভাবছি। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। পৃথিবীটা এমন যে বেশির ভাগ ইচ্ছাই কাজে খাটানো যায় না। আমি বসে বসে ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করছি। এতো ভোরে কেউ আমাকে নিতে আসবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রতিবছর হাজার খানিক বিদেশী ছাত্র নর্থডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে আসে। কার এতো গরজ পড়েছে এদের এয়ারপোর্ট থেকে খাতির করে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়ার?

তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র—আহামাদ? আমি চমকে তাকালাম। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যে মহিলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায়। অপূর্ব রূপবতী । যে পোশাক তাঁর গায়ে তার উদ্দেশ্য সম্ভবত শরীরের সুন্দর অংশগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন—তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র আহামাদ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

ঃ আমার নাম টয়লা ক্লেইন। আমি হচ্ছি নর্থডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার। আমি খুবই লজ্জিত যে দেরি করে ফেলেছি। চলো, রওনা হওয়া যাক। তোমার সঙ্গের সব জিনিসপত্র কি এই?

ঃ ইয়েস।

আমার সব জবাব এক শব্দে, ইয়েস এবং নো-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজিতে একটা পুরো বাক্য বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে একটা পুরো বাক্য বললেই এই ভদ্রমহিলা হা হা করে হেসে উঠবেন।

ঃ আহামাদ, তুমি কি রওনা হবার আগে এক কাপ কফি খাবে? বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। হঠাৎ কেন জানি ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। কফি আনবো?

ঃ না।

ঃ আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি পূর্বদেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো কিছু খাবার কথা বললেই তারা প্রথমে বলে 'না'। অথচ তাদের খাবার ইচ্ছা আছে। আমি শুনেছি 'না' বলাটা তাদের ভদ্রতার একটা অংশ। কাজেই আমি আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি—তুমি কি কফি খেতে চাও?

ঃ চাই।

ভদ্রমহিলা কাগজের গ্লাসে দু'কাপ কফি নিয়ে এলেন। এর চেয়ে কুৎসিত কোনো পানীয় আমি এই জীবনে খাইনি। কষা তিতকুটে একটা জিনিস। নাড়ীভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। ভদ্রমহিলা বললেন, হট কফি ভালো লাগছে না? আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, খুব ভালো।

টয়লা ক্লেইন হেসে ফেলে বললেন, আহামাদ তোমাকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। আমেরিকায় পূর্বদেশীয় ভদ্রতা অচল। এদেশে সব কিছু তুমি সরাসরি বলবে। কফি ভালো লাগলে বলবে—ভালো । খারাপ লাগলে কফির কাপ 'ইয়াক' বলে ছুঁড়ে ফেলবে ডাস্টবিনে।

আমি ইয়াক বলে একটা শব্দ করে ডাস্টবিনে কফির কাপ ছুঁড়ে ফেললাম। এই হচ্ছে আমেরিকায় আমেরিকানদের মতো আমার প্রথম আচরণ।

টয়লা ক্লেইনের গাঢ় লাল রঙের গাড়ি ডাউনটাউন ফারগোর দিকে যাচ্ছে। আমি ঝিম ধরে পেছনের সীটে বসে আছি। আশেপাশের দৃশ্য আমাকে মোটেই টানছে না। টয়লা ক্লেইন একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। প্রতিটি শব্দ খুব স্পষ্ট করে বললেন। তাতে বুঝতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হলো না।

আমেরিকানদের ইংরেজি বোঝা যায়। ব্রিটিশদেরটা বোঝা যায় না। ব্রিটিশরা অর্ধেক কথা বলে, অর্ধেক পেটে রেখে দেয়। যা বলে তা-ও বলার আগে মুখে খানিকক্ষণ রেখে গার্গল্‌ করে বলে আমার ধারণা।

ঃ আহামাদ, তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি 'হোটেল গ্রেভার ইনে।' হোটেল গ্রেভার ইন পুরোদস্তুর একটা হোটেল। তবে হোটেলের মালিক গত বছর এই হোটেল স্টেট ইউনিভার্সিটিকে দান করে দিয়েছেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা হোটেলটা চালাচ্ছে। অনেক গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এই হোটেলে থেকেই পড়াশোনা করে। তুমিও ইচ্ছা করলে তা করতে পারো। হোটেলের সব সুযোগ-সুবিধা এখানে আছে। বার আছে, বল রুম আছে, সাওয়ানা আছে। একটাই অসুবিধা, হোটেলটা ইউনিভার্সিটি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। তোমাকে বাসে যাতায়াত করতে হবে। এটা কোনো সমস্যা হবে না, হোটেল থেকে দু'ঘণ্টা পর পর ইউনিভার্সিটির বাস যায়। আমি কি বলছি বুঝতে পারছো তো?

ঃ পারছি।

ঃ তুমি এসেছো একটা অড টাইমে, স্প্রীং কোয়ার্টার শুরু হতে এখনো এগারো দিনের মতো বাকি। সামারের ছুটি চলছে। এই ক'দিন বিশ্রাম নাও। নতুন দেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতেও কিছু সময় লাগে। তাই না?

ঃ ইয়েস।

টয়লা ক্রেইন হেসে বললেন—ইয়েস এবং নো—এই দুটি শব্দ ছাড়াও তোমাকে আরো কিছু শব্দ শিখতে হবে। দুটি শব্দ সম্বল করে কথাবার্তা চালানো বেশ কঠিন।

তিনি আমাকে হোটেলের রিসিপশনে নিয়ে অতিক্রত কি সব বলতে লাগলেন ডেস্কে বসে থাকা পাথরের মতো মুখের মেয়েটিকে। সেইসব কথার এক বর্ণও আমি বুঝলাম না। বোঝার চেষ্টাও করলাম না। আমি তখন একটা দীর্ঘ বাক্য ইংরেজিতে তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। বাক্যটা বাংলায় এ রকম—মিসেস টয়লা ক্রেইন, আপনি যে এই ভোররাতে আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্য নিজে গিয়েছেন এবং নিজে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

বাক্যটা মনে মনে যখন প্রায় গুছিয়ে এনেছি তখন টয়লা ক্রেইন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাই। বলেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমার আর ধন্যবাদ দেয়া হলো না। এই মহিলার আচার-ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিলো উনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হাসিখুশি ধরনের মহিলা।

পরে জানলাম ইনি একজন খুবই ইনএফিসিয়েন্ট মহিলা। তাঁর অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার জন্যে পরের বছরই তাঁর চাকরি চলে যায়।

হোটেল গ্রেভার ইনে আমার জীবন শুরু হলো।

তিনতলা একটা হোটেল। পুরোনো ধরনের বিল্ডিং। এর সবই পুরোনো, কার্পেট পুরোনা, ঘরের বাতাসে পর্যন্ত একশ' বছর আগের গন্ধ। আমেরিকানরা ট্রাডিশনের খুব ভক্ত এটা বলা ঠিক হবে না। তবে ডাকোটা কান্ট্রির অনেক জায়গাতেই দেখেছি ওয়াইল্ড ওয়েস্ট ধরে রাখার একটা চেষ্টা। পুরোনো হোটেলগুলোকে পুরোনো করেই রাখা হয়েছে। দেয়ালে বাইসনের বড় বড় শিং। যত্ন করে ঝুলানো আগের আমলের পাইপ গান, বারুদের থলে। মেঝেতে বিছানো ভারি কার্পেটের রঙ বিবর্ণ। আমেরিকানরা হয়তো বা এসব দেখে নষ্টালজিক হয়। আমি হলাম বিরক্ত। কোথায় এরা আমাকে এনে তুললো?

আমার ঘরটা দোতলায়। বিরাট ঘর। দুটো খাট পাশাপাশি বিছানো। ঘরের আসবাবপত্র কোনোটাই আমার মন কাড়লো না। তবে দেয়ালজোড়া পুরোনো কালের আয়নাটা অপূর্ব। যেন বাংলাদেশের দিঘির কালো জলকে জমিয়ে আয়না বানিয়ে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছে। এ রকম চমৎকার আয়না এ যুগে তৈরি হয় কিনা আমি জানি না।

আমার পাশের ঘরে থাকেন নব্বুই বা এক শ' বছরের একজন বুড়ি। এই হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়াও বাইরের গেস্টরা ভাড়া দিয়ে থাকতে পারেন। লক্ষ্য করলাম গেস্টদের প্রায় সবাই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা শ্রেণীর। পরে জেনেছি, এদের অনেকেই জীবনের শেষের দিকে বছরের পর বছর হোটেলে কাটিয়ে দেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে নির্মিত ওল্ডহোমগুলো তাঁদের পছন্দ নয়। ওল্ড হোমগুলোতে তাঁরা হসপিটাল হসপিটাল গন্ধ পান। লোকজনও ওল্ড হাউসগুলোকে দেখে করুণার চোখে, এর চেয়ে হোটেলই ভালো।

পাশের ঘরের বৃদ্ধার নাম মনে পড়ছে না—সুসিন বা সুজি জাতীয় কিছু হবে। দেখতে অবিকল পথের পাঁচালির সত্যজিতের ছবির ইন্দিরা ঠাকরুণের মতো। মাথার চুল সেই রকম ছোটছোট করে কাটা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীর। শুধু পরনে শতছিন্ন শাড়ির বদলে স্কার্ট, ঠোঁটে লিপস্টিক। এই বৃদ্ধা, হোটেলে ঢোকার এক ঘন্টার মধ্যে আমার দরজায় নক করলেন। দরজা খোলামাত্র বললেন, সুপ্রভাত। তোমার কাছে কি ভারতীয় মুদ্রা আছে?

ঃ না।

ঃ স্ট্যাম্প আছে?

ঃ না, তা-ও নেই।

ঃ ও আচ্ছা। আমি মুদ্রা এবং স্ট্যাম্প দুটাই জমাই। এটা আমার হবি।

বৃদ্ধা বিমর্ষ মুখে চলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই মহিলা জীবনের শেষ কটি দিন স্ট্যাম্প বা মুদ্রা জমিয়ে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারলাম না। অন্য কোনো সঞ্চয় কি তাঁর জীবনে নেই? বৃদ্ধা চলে যাবার পর পরই হোটেলের লন্ড্রীর লোক ঢুকলো। কালো আমেরিকান। এর নাম জর্জ ওয়াশিংটন। নিগ্রোদের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের নাম অনুসারে নাম রাখার একটা প্রবণতা আছে। এই জর্জ ওয়াশিংটন সম্ভবত আমার গায়ের কৃষ্ণবর্ণের কারণে আমার প্রতি শুরুতেই গভীর মমতা দেখাতে শুরু করলো। গম্ভীর মুখে বললো, প্রথম এসেছো আমেরিকায়?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ পড়াশোনার জন্যে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ নিজেদের দেশে পড়াশোনা হয় না যে এই পচা জায়গায় আসতে হয়?

আমি নিশ্চুপ। সে গলা নামিয়ে বলল, বুড়িগুলোর কাছ থেকে সাবধানে থাকবে, এরা বড় বিরক্ত করে। মোটেই পাত্তা দেবে না।

ঃ ঠিক আছে।

ঃ মদ্যপান করো?

ঃ না।

ঃ মাঝে-মধ্যে করতে পারো, এতে দোষের কিছু নেই। তবে মেয়েদের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। হুকার(বেশ্যা)-দের নিয়ে বিছানায় যাবে না— অসুখ-বিসুখ হবে। তাছাড়া হুকারদের বেশিরভাগই হচ্ছে চোর, টাকা-পয়সা, ঘড়ি এইসব নিয়ে পালিয়ে যাবে। হুকার কি করে চিনতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো।

ঃ আচ্ছা।

ঃ খাওয়া-দাওয়া কোথায় করবে? হোটেলে?

ঃ হুঁ।

ঃ খবরদার, এই হোটেলের রেস্টুরেন্টে খাবে না। রান্না কুৎসিত, দামও বেশি। দুই ব্লক পরে একটা হোটেল আছে, নাম—বীফ এন্ড বান।

ঃ বীফ এন্ড বান?

ঃ হ্যাঁ। ঐখানে খাবার ভালো, দামেও সস্তা।

ঃ তোমাকে ধন্যবাদ।

ঃ ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। বিয়ে করেছো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বউয়ের ছবি আছে?

ঃ আছে।

ঃ দেখাও।

আমি ছবি বের করে দেখালাম। জর্জ ওয়াশিংটন নানা ভঙ্গিতে ছবি দেখে বলল—অপূর্ব সুন্দরী। তুমি অতি ভাগ্যবান।

আমেরিকানদের অনেক কুৎসিত অভ্যাসের পাশে-পাশে অনেক সুন্দর অভ্যাসও আছে। যার একটি হচ্ছে, ছবি দেখে মুগ্ধ হবার ভান করা। আমি লক্ষ্য করেছি, অতিসামান্য পরিচয়েও এরা বলে—ফ্যামিলি ছবি সঙ্গে আছে? দেখি কেমন?

ছবিতে যদি তারকা রাক্ষসীর মতো কোনো দাঁত বের করা মহিলাও থাকে, এরা বলবে, অপূর্ব! তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, লাকি ডগ।

এরা মানিব্যাগে ক্রেডিট কার্ডের পাশে নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ছবি রাখে। এর কোন ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না বলেই আমার ধারণা। অবশ্যি স্ত্রী বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ছবিও বদলায়। নতুন স্ত্রীকে দিনের মধ্যে একশবার মধুর কণ্ঠে হানি ডাকে। সেই হানি এক সময় হেমলক হয়ে যায়, তখন খোঁজ পড়ে নতুন কোনো হানির। মানিব্যাগে আবার ছবি বদল হয়।

জর্জ ওয়াশিংটন চলে গেলো। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত একা-একা নিজের ঘরে বসে রইলাম। কিছুই ভালো লাগে না। ঘরে চিঠি লেখার কাগজপত্র আছে। চিঠি লিখতে ইচ্ছে করলো না। সঙ্গে একটিমাত্র বাংলা বই—রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। ভেবেছিলাম একাকীত্বের জীবন গল্পগুলো পড়তে ভালো লাগবে। আমার প্রিয় গল্পের একটি পড়তে চেষ্টা করলাম—

. . . সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি এবং বউ বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতেন, আহা দুটিতে বেশ মানায় . . .

আমার এতো প্রিয় গল্প অথচ পড়তে ভালো লাগলো না, ইচ্ছে হলো হোটেলের জানালা খুলে নিচে লাফিয়ে পড়ি।

রাতে খেতে গেলাম 'বীফ এন্ড বান' রেস্টুরেন্টে। আলো ঝলমল ছোটখাট একটা রেস্টুরেন্ট। বিমানবালাদের মতো পোশাকের তিনটি ফুটফুটে তরুণী খাবার দিচ্ছে। অর্ডার নিচ্ছে। মাঝে-মাঝে রসিকতা করছে। এদের চেহারা যেমন সুন্দর কথাবার্তাও তেমনি মিষ্টি। আমেরিকান সুন্দরীরা কেমন তা দেখতে হলে এদের বার রেস্টুরেন্টে উঁকি দিয়ে ওয়েট্রেসদের দেখতে হয়।

আমি কোণার দিকের একটা টেবিলে বসলাম। আমার পকেটে আছে মাত্র পনেরো ডলার। উনিশশো সাতাত্তর সালের কথা, তখন দেশের বাইরে কুড়ি ডলারের বেশি নেয়া যেতো না। আমি কুড়ি ডলার নিয়েই বের হয়েছিলাম। পথে লোভে পড়ে এক কার্টুন মার্লবোরো সিগারেট কিনে ফেলায় ডলারের সঞ্চয় কমে গেছে। মেনু দেখে আঁতকে উঠলাম। সব খাবারের দাম আট ডলার নয় ডলার। স্টেক জাতীয় খাবারগুলোর দাম আরো বেশি। বেছে-বেছে সবচে কমদামী একটা খাবারের অর্ডার দিলাম—ফ্রেঞ্চ টোস্ট। দামে সস্তা, তাছাড়া চেনা খাবার। ওয়েট্রেস অবাক হয়ে বললো, এটাই কি তোমার ডিনার? আমি বললাম, ইয়েস।

ঃ সঙ্গে আর কিছু নেবে না? কোল্ড ড্রিংক কিংবা কফি?

ঃ নো।

রাতের খাবার শেষ করে একা-একা হোটেলের লাউঞ্জে বসে রইলাম। লাউঞ্জ প্রায় ফাঁকা। এক কোণায় দুইজন বুড়োবুড়ি ঝিম মেরে বসে আছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে জীবনের বাকি দিনগুলো কী করে কাটাবে এরা এই নিয়েই চিন্তিত। ওদের চেয়ে আমি নিজেকে আলাদা করতে পারলাম না।

পাশের ঘরেই হোটেলের বার। সেখানে উদ্দাম গান হচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নারী-পুরুষ জড়াজড়ি করে নাচছে। গানের কথাগুলো পরিষ্কার নয়। একটি চরণ বার বার ফিরে ফিরে আসছে—**Whom do you want to love yea? Yea** শব্দটির মানে কি কে জানে?

রাতে ঘুম এলো না ভয়ে—ভূতের ভয়।

এই ভূতের ভয়ের মূল কারণ, আমার ঘরে রাখা হোটেল গ্রেভার ইন সম্পর্কিত একটি তথ্য-পুস্তিকা। সেখানে আছে, এই পাথরের হোটেলটি কে প্রথম বানিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে তথ্য। বিখ্যাত ব্যক্তি কারা-কারা এই হোটেলে ছিলেন তাঁদের নাম-ধাম। সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তির কাউকেই চিনতে পারলাম না, তবে এই

হোটেলে একটি ভৌতিক কক্ষ আছে জেনে আঁতকে উঠলাম। রুম নম্বর ৩০৯–এ একজন অশরীরী মানুষ থাকেন বলে একশ বছরের জনশ্রুতি আছে। যিনি এখানে বাস করেন তাঁর নাম জন পাউল। পেশায় আইনজীবী ছিলেন। এই হোটেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরও হোটেলের মায়া কাটাতে পারেননি। পুস্তিকায় লেখা এই বিদেহী আত্মা অত্যন্ত শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের। কাউকে কিছুই বলেন না। গভীর রাতে পাইপ হাতে হোটেলের বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেড়ান।

হোটেলের তিনশ নয় নম্বর কক্ষটিতে কোনো অতিথি রাখা হয় না। বছরের পর বছর এটা খালি থাকে, তবে রোজ পরিষ্কার করা হয়। বিছানার চাদর বদলে দেয়া হয়। বাথরুমে নতুন সাবান, টুথপেস্ট দেয়া হয়। ঘরের সামনে একটা সাইন বোর্ড আছে, সেখানে লেখা—'মিঃ জন পাউলের ঘর। নীরবতা পালন করুন। জন পাউল নীরবতা পছন্দ করেন।'

পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের রসিকতা কিংবা আমেরিকানদের ব্যবসা-কৌশলের একটা অংশ, তবু রাত যতোই বাড়তে লাগলো মনে হতে লাগলো এই বুঝি জন পাউল এসে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে বলবেন—তোমার কাছে কি আগুন আছে? আমার পাইপের আগুন নিভে গেছে।

এমনিতেই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি, তার উপর পাশের ঘরের বৃদ্ধা বিচিত্র সব শব্দ করছেন—এই খকখক করে কাশছেন, এই চেয়ার ধরে টানাটানি করছেন, গানের সিকি অংশ শুনছেন, দরজা খুলে বেরুচ্ছেন আবার ঢুকছেন। শেষ রাতের দিকে মনে হলো দেশ-গাঁয়ের মেয়েদের মতো সুর করে বিলাপ শুরু করেছেন।

নিঃসঙ্গ মানুষদের অনেক ধরনের কষ্ট থাকে।

পুরোপুরি না ঘুমিয়ে কেউ রাত কাটাতে পারে না। শেষ রাতের দিকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ঘুম আসে। কিন্তু আমার এলো না। পুরো রাত চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম। ভোরবেলা আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল টেলিফোন করলো ওয়াশিংটন সিয়াটল থেকে। সে আমার আগে এদেশে এসেছে। পি-এইচ-ডি করছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে। পরিষ্কার লজিকের ঠাণ্ডা মাথার একটা ছেলে। ভাবালুতা কিংবা অস্থিরতার কিছুই তার মধ্যে নেই। জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণার ফাঁকে-ফাঁকে সে অসম্ভব সুন্দর কিছু লেখা লিখে ফেলেছে—কপোট্রনিক সুখ-দুঃখ, দীপু নাম্বার টু, হাত কাটা রবীন। প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছি, তবু বলার লোভ সামলাতে পারছি না। জাফর ইকবালের লেখা পড়লে ঈর্ষার সূক্ষ্ম খোঁচা অনুভব করি। এই ক্ষমতাবান প্রবাসী লেখক দেশে তাঁর যোগ্য সম্মান পেলেন না, এই দুঃখ আমার কোনোদিন যাবে না।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইকবাল টেলিফোন করে খাস ময়মনসিংহের উচ্চারণে বললো—দাদাভাই কেমন আছো?

আমি বললাম, তুই আমার টেলিফোন নাম্বার কোথায় পেলি?

ঃ আমেরিকায় টেলিফোন নাম্বার পাওয়া কোন সমস্যা না। তুমি কেমন আছো বল?

ঃ তোর কাছে ডলার আছে?

ঃ তোমাকে একশ ডলারের একটা ড্রাফট পাঠিয়ে দিয়েছি। আজই পাবে।

ঃ একশ ডলারে হবে না। তুই আমাকে একটা টিকিট কেটে দে আমি দেশে চলে যাবো।

আমার কথায় সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। সহজ গলায় বললো, যেতে চাও কোনো অসুবিধা নেই টিকিট কেটে দেবো। কয়েকটা দিন যাক। একটু ঘুরে-ফিরে দেখো। এখানে বাংলাদেশী ছেলে নেই?

ঃ বাংলাদেশী ছেলের আমার কোনো দরকার নেই। তুই টিকিট কেটে পাঠা।

ঃ আচ্ছা পাঠাবো। তুমি কি পৌছার সংবাদ দেশে দিয়েছো? ভাবীকে চিঠি লিখেছো?

ঃ চিঠি লেখার দরকার কি আমি নিজেই তো যাচ্ছি।

ঃ তা ঠিক। তবু লিখে দাও। যেতে-যেতেও তো সময় লাগবে। আজই লিখে ফ্যালো। আর শোনো, তোমার যে খুব খারাপ লাগছে দেশে চলে যেতে চাচ্ছো এইসব না লিখলেই ভালো হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ইকবাল বললো, রাতে তোমাকে আবার টেলিফোন করবো। আর আমি তোমাদের ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারকেও ফোন করে বলে দিচ্ছি যাতে তিনি বাংলাদেশী ছেলেদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দেন।

সেই সময় ফার্গো শহরে আর একজন মাত্র বাঙালী ছিলেন—সুফী সাহেব। তিনি এসেছেন এগ্রোনমিতে পি-এইচ-ডি করতে। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রকম যোগাযোগ হলো না। দিনের বেলাটা ইউনিভার্সিটিতে খানিকক্ষণ ঘুরলাম। চারদিকে বড় বেশি ঝকঝকে, তকতকে। বড় বেশি গোছানো। বিশ্ববিদ্যালয় সামারের বন্ধ থাকলেও কিছু কিছু ক্লাস হচ্ছে। একটা ক্লাস রুমে উঁকি দিয়ে দেখি অনেক ছেলেমেয়ের হাতে কফির কাপ কিংবা কোল্ড ড্রিংকের বোতল। আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনছে। পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ আছে। এক ধরনের কাছে বিদেশের সব কিছুই ভালো লাগে, অন্যদের কিছুই

ভালো লাগে না। আমি দ্বিতীয় দলের। আমার কাছে কিছুই ভালো লাগে না। যা দেখি তাতেই বিরক্ত হই।

রাতে আবার খেতে গেলাম বীফ এণ্ড বানে। সেই পুরাতন খাবার। ফ্রেঞ্চ টোস্ট। রুটিনটি হলো এ-রকম ঃ সকালবেলা ইউনিভার্সিটি এলাকায় যাই। একা একা হাঁটাহাঁটি করি—যা দেখি তাই খারাপ লাগে। সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরত আসি। রাতে খেতে যাই বীফ এন্ড বানে। ফ্রেঞ্চ টোস্টের অর্ডার দেই। অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। ডলারের অভাব এখন আর আমার নেই। ইউনিভার্সিটি আমাকে চারশ ডলার অগ্রিম দিয়েছে। সিয়াটল থেকে পাঠানো ছোট ভাইয়ের চেকটাও ভাঙিয়েছি। টাকার অভাব নেই। বীফ এন্ড বানে খাবারেরও অভাব নেই। কিন্তু কোনো খাবারই খেতে ইচ্ছা করে না। খেতে গেলেই চোখের সামনে ভাসে এক প্লেট ধবধবে সাদা ভাত—একটা বাটিতে সর্ষেবাটা দিয়ে রাঁধা ইলিশ। ছোট্ট পিরিচে কাঁচা লংকা, আধখান কাগজী লেবু। আমার প্রাণ হু-হু করে। ওয়েট্রেস যখন অর্ডার নিতে আসে, আমি বলি ফ্রেঞ্চ টোস্ট। সে অবাক হয়ে তাকায় । হয়তো ইতিমধ্যে এই রেস্টুরেন্টে আমার নামই হয়ে গেছে 'ফ্রেঞ্চ টোস্ট'। আমি লক্ষ্য করছি—আমাকে দেখলেই ওয়েট্রেসরা নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে এবং এক সময় এসে কোমল গলায় বলে, সে-ই খাবার?

আমি বলি, ইয়েস।

ছুটি দীর্ঘ রজনী কেটে গেলো। তারপর চমৎকার একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটলো। ঘটনাটা বিশদভাবে বলা দরকার। এই ঘটনা না ঘটলে হয়তো আমি আমেরিকায় থাকতে পারতাম না। সব ছেড়েছুঁড়ে চলে আসতাম।

যথারীতি রাতে খাবার খেতে গিয়েছি। ওয়েট্রেস অর্ডার নিতে আমার কাছে আর আসছে না। আমার কেন জানি মনে হলো দূর থেকে সবাই কৌতূহলী ভঙ্গিতে আমাকে দেখছে। ফিসফাস করছে। তাদের দোষ দিচ্ছি না। দিনের পর দিন ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেয়ে-খেয়ে আমিই এই অবস্থাটা তৈরি করেছি। একা অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর অর্ডার নিতে একটি মেয়ে এলো। আমাকে অবাক করে দিয়ে বসলো আমার সামনের চেয়ারে। যে কথাগুলো সে আমাকে বললো তা শোনার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েটি নিচু গলায় বললো,

ঃ দ্যাখো আহামাদ, আমরা জানি তোমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। দিনের পর দিন তুমি একটা কুৎসিত খাবার মুখ বুঁজে খেয়ে যাচ্ছো। টাকা-পয়সার কষ্টের মতো কষ্ট তো আর কিছুই হতে পারে না। তবু বলছি, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। দুঃসময় একদিন অবশ্যই কাটবে।

আমি একবার ভাবলাম বলি, তোমরা যা ভাবছো ব্যাপারটা সে রকম নয়। পরমুহূর্তেই মনে হলো—এটা বলার দরকার নেই। এটা বলা মানেই এদের ভালোবাসার অপমান করা। আমি তা হতে দিতে পারি না।

মেয়েটি বললো, আজ তোমার জন্যে আমরা ভালো একটা ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। এর জন্যে তোমাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না। তুমি আরাম করে খাও এবং মনে সাহস রাখো।

সে উঠে গিয়ে বিশাল ট্রে-তে করে টি-বোন স্টেক নিয়ে এলো। সঙ্গে নানান ধরনের টুকিটাকি। কফি এলো, আইসক্রীম এলো। ওয়েট্রেসরা সবাই একবার করে দেখে গেলো আমি ঠিকমতো খাচ্ছি কিনা। আমি খুব আবেগপ্রবণ ছেলে, আমার চোখে পানি এসে গেলো। এরা এতো মমতা একজন অচেনা-অজানা ছেলের জন্যে রেখে দিয়েছিলো? মেয়েগুলো আমার চোখের জল দেখতে পেলেও ভান করলো যেন দেখতে পায়নি।

গভীর আনন্দ নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরে এলাম। রিসিপশনে বসে থাকা গোমরা মুখের মেয়েটাকে আজ অনেক ভালো লাগলো। আমি হাসিমুখে বললাম, হ্যালো।

সে-ও হাসিমুখে বললো, হ্যালো।

গ্রেভার ইন বার-এর উদ্দাম গান আজ শুনতে ভালো লাগলো। ইচ্ছে করলো ভেতরে ঢুকে খানিকক্ষণ শুনি।

আমার পাশের বৃদ্ধার ঘরে নক করে তাঁকে বললাম—আমার কাছে দুটো বাংলাদেশী মুদ্রা আছে তুমি কি নেবে?

অনেক রাতে স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসলাম। সেই চিঠিটা খুব অদ্ভুত ছিলো। কারণ চিঠিতে তুষারপাতের একটা বানানো বর্ণনা ছিলো। তুষারপাত না দেখেই আমি লিখলাম—আজ বাইরে খুব তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তাঘাট ঢেকে গেছে সাদা বরফে। সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি হোটেলের জানালার কাছে বসে-বসে লিখছি। তুমি পাশে থাকলে দুজন হাত ধরাধরি করে তুষারের মধ্যে দাঁড়াতাম।

যে তিনজন তরুণী আমেরিকা প্রসঙ্গে আমার ধারণাই বদলে দিলো আজ তাঁদের কথা গভীর মমতা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করছি। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খন্ডে আজ আমরা বিভক্ত। কতো দেশ, কতো নাম—কিন্তু মানুষ একই আছে। আসছে লক্ষ বছরেও তা-ই থাকবে।

ডানবার হলের জীবন

নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলো যেখানে হয় তার নাম ডানবার হল। ডানবার হলের তেত্রিশ নম্বর কক্ষে ক্লাস শুরু হল। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্লাস। কোর্স নাম্বার ৫২৯।

কোর্স নাম্বারগুলি সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিয়ে নেই। টু হানড্রেড লেভেলের কোর্স হচ্ছে আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের নিচের দিকের ছাত্রদের জন্যে। থ্রী হানড্রেড লেভেল হচ্ছে আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের উপরের দিকের ছাত্রদের জন্যে। ফোর হানড্রেড এবং ফাইভ হানড্রেড লেভেল হচ্ছে গ্রাজুয়েট লেভেল।

ফাইভ হানড্রেড লেভেলের যে কোর্সটি আমি নিলাম সে সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণা ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প কিছু কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়েছি। একেবারে কিছুই যে জানি না তাও না। তবে এই বিষয়ে আমার বিদ্যা খুবই ভাসাভাসা। জলের উপর ওড়াউড়ি, জল স্পর্শ করা নয়।

একাডেমিক বিষয়ে নিজের মেধা এবং বুদ্ধির উপর আমার আস্থাও ছিল সীমাহীন। রসায়নের একটি বিষয় আমি পড়ে বুঝতে পারব না, তা হতেই পারে না।

আমাদের কোর্স কো-অর্ডিনেটর আমাকে বললেন, ফাইভ হানড্রেড লেভেলের এই কোর্সটি যে তুমি নিচ্ছ, ভুল করছ না তো? পারবে?

আমি বললাম, ইয়েস।

তখনো ইয়েস এবং নো-র বাইরে তেমন কিছু বলা রপ্ত হয়নি। কোর্স কো-অর্ডিনেটর বললেন, এই কোর্সে ঢুকবার আগে কিন্তু ফোর হানড্রেড লেভেলের কোর্স শেষ করনি। ভাল করে ভেবে দেখ, পারবে?

ঃ ইয়েস।

কোর্স কো-অর্ডিনেটরের মুখ দেখে মনে হল তিনি আমার ইয়েস শুনেও বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না।

ক্লাস শুরু হল। ছাত্র সংখ্যা পনেরো। বিদেশী বলতে আমি এবং ইণ্ডিয়ান এক মেয়ে—কান্তা। ছাত্রদের মধ্যে একজন অন্ধ ছাত্রকে দেখে চমকে উঠলাম। সে তার

ব্রেইলি টাইপ রাইটার নিয়ে এসেছে। ক্লাসে ঢুকেই সে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমি বক্তৃতা টাইপ করব। খটখট শব্দ হবে, এ জন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি' আমি হতভম্ব। অন্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এটা আমি জানি। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু অন্ধ ছাত্র-ছাত্রী আছে, তবে তাদের বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা বা দর্শন। কিন্তু থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রিও কেউ পড়তে আসে আমার জানা ছিল না।

আমাদের কোর্স টিচারের নাম, মার্ক গর্ডন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মস্তান লোক। থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রির লোকজন তাঁর নাম শুনলে চোখ কপালে তুলে ফেলে। তাঁর খ্যাতি প্রবাদের পর্যায়ে চলে গেছে।

লোকটি অসম্ভব রোগা এবং তালগাছের মত লম্বা। মুখ ভর্তি প্রকাণ্ড গোঁফ। ইউনিভার্সিটিতে আসেন ভালুকের মত বড় একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি যখন ক্লাসে যান কুকুরটা তাঁর চেয়ারে পা তুলে বসে থাকে।

মার্ক গর্ডন ক্লাসে ঢুকলেন একটা টি শার্ট গায়ে দিয়ে। সেই টি শার্টে যা লেখা, তার বঙ্গানুবাদ হল, সুন্দরী মেয়েরা আমাকে ভালবাসা দাও।

ক্লাসে ঢুকেই সবার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। সবাই বসে বসে উত্তর দিল। একমাত্র আমি দাঁড়িয়ে জবাব দিলাম। মার্ক গর্ডন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন? বসে কথা বলতে কি তোমার অসুবিধা হয়?

আমি জবাব দেবার আগেই কান্তা বলল, এটা হচ্ছে ভারতীয় ভদ্রতা।

মার্ক গর্ডন বললেন, হুমায়ূন তুমি কি ভারতীয়?

ঃ না। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

ঃ ও আচ্ছা, আচ্ছা। বাংলাদেশ। বস। এর পর থেকে বসে বসে কথা বলবে।

আমি বসলাম। মানুষটাকে ভাল লাগল এই কারণে যে সে শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করেছে। অধিকাংশ আমেরিকান যা পারে না কিংবা শুদ্ধ উচ্চারণের চেষ্টা করে না। আমাকে যে সব নামে ডাকা হয় তার কয়েকটি হচ্ছে ঃ হামায়ান, হিউমেন, হেমীন।

মার্ক গর্ডন টেবিলে পা তুলে বসলেন এবং বললেন, ক্লাস শুরু করার আগে একটা জোক বলা যাক। আমি আবার ডার্টি জোক ছাড়া অন্য কিছু জানি না। যারা ডার্টি জোক শুনতে চাও না, তারা দয়া করে কান বন্ধ করে ফেল।

গল্পটি হচ্ছে এক ফরাসী তরুণীকে নিয়ে যার একটি স্তন বড় অন্যটি ছোট। বিয়ের রাতে তার স্বামী ...

গল্পটি চমৎকার, তবে এ দেশে তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব না বলে শুধু

শুরুটা বললাম। গল্প শেষ হবার পর হাসি থামতে পাঁচ মিনিটের মত লাগল। শুধু কান্তা হাসল না, মুখ লাল করে বসে রইল। যেন পুরো রসিকতাটা তাকে নিয়েই করা হয়েছে।

মার্ক গর্ডন লেকচার শুরু করলেন। ক্লাসের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, সহজ ব্যাপারগুলি নিয়ে আজ কথা বললাম, প্রথম ক্লাস তো তাই।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কিছু বুঝতে পারিনি। তিনি ব্যবহার করছেন গ্রুপ থিওরী, যে গ্রুপ থিওরীর আমি কিছুই জানি না।

আমি আমার পাশে বসে থাকা আমেরিকান ছাত্রটিকে বললাম, তুমি কি কিছু বুঝতে পারলে?

সে বিস্মিত হয়ে বলল, কেন বুঝব না, এসব তো খুবই এলিমেন্টারি ব্যাপার। এক সপ্তাহ চলে গেল। ক্লাসে যাই, মার্ক গর্ডনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিছু বুঝতে পারি না। নিজের মেধা এবং বুদ্ধির উপর যে আস্থা ছিল তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর প্রচুর বই জোগাড় করলাম। রাত দিন পড়ি। কোন লাভ হয় না। এই জিনিস বোঝার জন্য ক্যালকুলাসের যে জ্ঞান দরকার তা আমার নেই। আমার ইনসমনিয়ার মত হয়ে গেল। ঘুমুতে পারি না। গ্রেভার ইনের লবিতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি। মনে মনে বলি—কী সর্বনাশ!

আমার পাশের ঘরের বৃদ্ধা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, তোমার কি হয়েছে বলতো? তুমি কি অসুস্থ? স্ত্রীর চিঠি পাচ্ছ না?

দেখতে দেখতে মিড-টার্ম পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পর পর যে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে তা ভেবে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবার জোগাড় হল। মার্ক গর্ডন যখন দেখবে বাংলাদেশের এই ছেলে পরীক্ষার খাতায় কিছুই লেখেনি তখন তিনি কি ভাববেন? ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানই বা কী ভাববেন?

এই চেয়্যরম্যানকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সভাপতি প্রফেসর আলি নওয়াব আমার প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে লিখেছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ যে অল্প সংখ্যক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র তৈরি করেছে, হুমায়ূন আহমেদ তাদের অন্যতম।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটি যখন শূন্য পাবে তখন কী হবে? রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

মিড-টার্ম পরীক্ষায় বসলাম। সব মিলিয়ে দশটি প্রশ্ন।

এক ঘন্টা সময়ে প্রতিটির উত্তর করতে হবে। আমি দেখলাম একটি প্রশ্নের অংশবিশেষের উত্তর আমি জানি, আর কিছুই জানি না। অংশবিশেষের উত্তর লেখার কোন মানে হয় না। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। এক ঘন্টা পর সাদা খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে এলাম।

পরদিনই রেজাল্ট হল। এ-তো আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় যে পনেরোটি খাতা দেখতে পনেরো মাস লাগবে।

তিনজন এ পেয়েছে। ছ'জন বি। বাকি সব সি। বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছে শূন্য। সবচে বেশি নম্বর পেয়েছে অন্ধ ছাত্রটি। [এ ছেলেটির নাম আমার মনে পড়ছে না। তার নামটা মনে রাখা উচিত ছিল।]

মার্ক গর্ডন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বিস্মিত গলায় বললেন, ব্যাপারটা কী বলতো?

আমি বললাম, কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমার কোন ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিল না। এই হায়ার লেভেলের কোর্স আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঃ বুঝতে পারছ না তাহলে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? ঝুলে থাকার মানে কি?

ঃ আমি ছাড়তে চাই না।

ঃ তুমি বোকামি করছ। তোমরা গ্রেড যদি খারাপ হয়, যদি গড় গ্রেড সি চলে আসে তাহলে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হবে। গ্রাজুয়েট কোর্সের এ-ই নিয়ম।

ঃ এই নিয়ম আমি জানি।

ঃ জেনেও তুমি এই কোর্সটা চালিয়ে যাবে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তুমি খুবই নির্বোধের মত কথা বলছ।

ঃ হয়ত বলছি। কিন্তু আমি কোর্সটা ছাড়ব না।

ঃ কারণটা বল।

ঃ একজন অন্ধ ছাত্র যদি এই কোর্সে সবচে বেশি নম্বর পেতে পারে আমি পারব না কেন? আমার তো চোখ আছে।

তুমি আবারো নির্বোধের মত কথা বলছ। সে অন্ধ হতে পারে কিন্তু তার এই বিষয়ে চমৎকার ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। সে আগের কোর্স সবগুলি করেছে। তুমি করনি। তুমি আমার উপদেশ শোন। এই কোর্স ছেড়ে দাও।

ঃ না।

আমি ছাড়লাম না। নিজে নিজে অংক শিখলাম। গ্রুপ থিওরী শিখলাম, অপারেটর এলজেব্রা শিখলাম। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই এই প্রবাদটি সম্ভবত ভুল নয়। এক সময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুঝতে শুরু করেছি।

ফাইন্যাল পরীক্ষায় যখন বসলাম তখন আমি জানি আমাকে আটকানোর কোন পথ নেই। পরীক্ষা হয়ে গেল। পরদিন মার্ক গর্ডন একটি চিঠি লিখে আমার মেইল বক্সে রেখে দিলেন। টাইপ করা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ

—তুমি যদি আমার সঙ্গে থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে কাজ কর তাহলে আমি আনন্দিত হব এবং তোমার জন্যে আমি একটি ফেলোশীপ ব্যবস্থা করে দেব। তোমাকে আর কষ্ট করে টিচিং অ্যাসিসটেন্টশীপ করতে হবে না।

একটি পরীক্ষা দিয়েই আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হয়ে গেলাম। বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিজের উদ্যোগে ব্যবস্থা করে দিলেন যেন আমি আমার স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে আসতে পারি।

পরীক্ষায় কত পেয়েছিলাম তা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। পাঠক-পাঠিকারা আমার এই লোভ ক্ষমার চোখে দেখবেন বলে আশা করি। আমি পেয়েছিলাম ১০০তে ১০০।

বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি পড়াই। ক্লাসের শুরুতে ছাত্রদের এই গল্পটি বলি। শ্রদ্ধা নিবেদন করি ঐ অন্ধ ছাত্রটির প্রতি, যার কারণে আমার পক্ষে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।

আরেকটি কথা, আমি কিন্তু মার্ক গর্ডনের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হইনি। এই বিষয়টি নিয়ে আর কষ্ট করতে ইচ্ছা করছিল না, তাছাড়া আমার খানিকটা কুকুর-ভীতি আছে। মার্ক গর্ডনের ভালুকের মত কুকুরটিকে পাশে নিয়ে কাজ করার প্রশ্নই উঠে না।

বাংলাদেশ নাইট

ভোর চারটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল, অসময়ে টেলিফোন মানেই রিসিভার না নেয়া পর্যন্ত বুক ধড়ফর। নির্ঘাৎ বাংলাদেশের কল। একগাদা টাকা খরচ করে কেউ যখন বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় কল করে তখন ঘটনা খারাপ ধরেই নিতে হবে। নিশ্চয়ই কেউ মারা-টারা গেছে।

তিনবার রিং হবার পর আমি রিসিভার তুলে ভয়ে ভয়ে বললাম, হ্যালো।

ওপার থেকে ভারী গলা শোনা গেল, হুমায়ূন ভাই, খিচুড়ি কি করে রান্না করতে হয় জানেন?

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। টেলিফোন করেছে মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির মিজানুল হক। সেখানকার একমাত্র বাঙালী ছাত্র। অ্যাকাউন্টিং-এ আণ্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স করছে।

ঃ হ্যালো হুমায়ূন ভাই, কথা বলছেন না কেন? খিচুড়ি কী করে রান্না করতে হয় জানেন?

ঃ না।

ঃ তাহলে তো বিগ প্রবলেম হয়ে গেল।

আমি চুপ করে রইলাম। মিজানুল হক হড়বড় করে বলল, কাচ্চি বিরিয়ানির প্রিপারেশন জানা আছে?

আমি শীতল গলায় বললাম, কটা বাজে জান?

ঃ কটা?

ঃ রাত চারটা।

ঃ বলেন কি? এত রাত হয়ে গেছে? সর্বনাশ!

ঃ করছিলে কি তুমি?

ঃ বাংলাদেশের ম্যাপ বানাচ্ছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন হুমায়ূন ভাই। সকালে টেলিফোন করব, বিরাট সমস্যায় পড়েছি।

মিজানুল হক খট করে টেলিফোন রেখে দিল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। পার্কোলেটরে কফি বসিয়ে দিলাম। আমার ঘুমাবার চেষ্টা করা বৃথা। মিজানুল

হকের মাথার ঠিক নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার টেলিফোন করবে। অন্য কোন খাবারের রেসিপি জানতে চাইবে।

এ ব্যাপারটা গত তিন দিন ধরে চলছে। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্যান্য দেশের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে বাংলাদেশ নাইট। এই অঞ্চলে বাংলাদেশের একমাত্র ছাত্র হচ্ছে মিজান, আর আমি আছি নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। মিজানের একমাত্র পরামর্শদাতা। আশপাশে সাতশ মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় বাঙালী নেই।

কফির পেয়ালা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মিজানের টেলিফোন—

ঃ হ্যালো হুমায়ূন ভাই?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়ে আপনার সঙ্গে আরেকবার বসা দরকার।

ঃ এখনো তো দেরি আছে।

দেরি আপনি কোথায় দেখলেন? এক সপ্তাহ মাত্র। শালাদের একটা ভেলকি দেখিয়ে দেব। বাংলাদেশ বললে চিনতে পারে না, হা-করে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছা করে চড় মেরে মুখ বন্ধ করে দেই। এইবার শালারা বুঝবে বাংলাদেশ কি জিনিস। ঠিক না হুমায়ূন ভাই?

ঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

ঃ শালাদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে দেখবেন। আমি আপনার এখানে চলে আসছি।

মিজান টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। আমি আরেকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এই ছেলেটিকে আমি খুবই পছন্দ করি। তার সমস্যা একটাই, সারাক্ষণ মুখে— বাংলাদেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন একটা খোলার চেষ্টা করেছিল। একজন ছাত্র থাকলে এসোসিয়েশন হয় না বলে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। অন্য স্টেট থেকে বাংলাদেশী ছাত্র আনার চেষ্টাও করেছে, লাভ হয়নি। এই প্রচণ্ড শীতের দেশে কেউ আসতে চায় না। শীতের সময় এখানকার তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রী নিচে নেমে যায়, কে আসবে এই রকম ভয়াবহ ঠাণ্ডা একটা জায়গায়?

মিজান এই ব্যাপারে বেশ মনমরা হয়েছিল। বাংলাদেশ নাইট-এর ব্যাপারটা এসে পড়ায় সেই দুঃখ খানিকটা কমেছে। এই বাংলাদেশ নাইট নিয়েও বিরাট কাণ্ড। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার মিজানকে বলল, তুমি এক কাজ কর—তুমি বাংলাদেশ নাইট পাকিস্তানীদের সঙ্গে কর।

মিজান হুংকার দিয়ে বলল, কেন?

ঃ এতে তোমার সুবিধা হবে। ডবল ডেকোরেশন হবে না। এক খরচায় হয়ে যাবে। তুমি একা মানুষ।

ঃ তোমার এত বড় সাহস, তুমি পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমাকে বাংলাদেশ নাইট করতে বলছ? তুমি কি জান, ওরা কী করেছে? তুমি কি জান ওরা আমাদের কতজনকে মেরেছে? তুমি কি জান ...?

ঃ কী মুশকিল—তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

ঃ তুমি আজেবাজে কথা বলবে, তুমি আমার দেশকে অপমান করবে, আর আমি তোমার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলব?

মিজান, ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারের সামনের টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। টেবিলে রাখা কফির পেয়ালা উল্টে পড়ল। লোকজন ছুটে এল। প্রচণ্ড হেঁচৈ।

এরকম মাথা গরম একটা ছেলেকে সব সময় সামলে-সুমলে রাখা মুশকিল। তবে ভরসা একটাই—সে আমাকে প্রায় দেবতার পর্যায়ে ফেলে রেখেছে। তার ধারণা আমার মতো জ্ঞানী-গুণী মানুষ শতাব্দীতে এক-আধটা জন্মায়। আমি যা বলি, শোনে।

মিজান তার ভাঙা মবিস মাইনর নিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে এল। সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাপ নিয়ে এসেছে। সেই ম্যাপ দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। যে কটা রঙ পাওয়া গেছে সব কটাই সে লাগিয়েছে।

ঃ জিনিসটা দাঁড়িয়েছে কেমন বলুন তো?

ঃ রঙ একটু বেশি হয়ে গেল না?

ঃ ওরা রঙ-চঙ একটু বেশি পছন্দ করে হুমায়ূন ভাই।

ঃ তাহলে ঠিকই আছে।

ঃ এখন আসুন প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলা যাক। বাংলাদেশী খাবারের নমুনা হিসাবে খিচুড়ি খাওয়ানো হবে। খিচুড়ির শেষে দেওয়া হবে পান-সুপারি।

ঃ পান-সুপারি পাবে কোথায়?

ঃ শিকাগো থেকে আসবে। ইণ্ডিয়ান সপ আছে—ওরা পাঠাবে। ডলার পাঠিয়ে চিঠি দিয়ে দিয়েছি।

ঃ খুব ভালো।

ঃ দেশ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেয়া হবে। বক্তৃতার শেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। সবার শেষে জাতীয় সঙ্গীত।

ঃ জাতীয় সঙ্গীত গাইবে কে

ঃ কেন, আমি আর আপনি।

ঃ তুমি পাগল হয়েছ? জীবনে আমি কোনদিন গান গাইনি।

ঃ আর আমি বুঝি হেমন্ত? এইসব চলবে না, হুমায়ূন ভাই। আসুন গানটা একবার প্র্যাকটিস করি।

ঃ মিজান, মরে গেলেও তুমি আমাকে দিয়ে গান গাওয়াতে পারবে না। তাছাড়া এই গানটার আমি কথা জানি না, সুর জানি না।

ঃ কথা সুর তো আমিও জানি না হুমায়ূন ভাই। চিন্তা নেই, একটা ব্যবস্থা হবেই।

উৎসবের দিন ভোর বেলাতে আমরা প্রকাণ্ড সসপ্যানে খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম। চাল, ডাল, আনাজপাতি সেদ্ধ হচ্ছে। দুটো মুরগি কুচি কুচি করে ছেড়ে দেয়া হল। এক পাউণ্ডের মত কিমা ছিল তাও ঢেলে দিলাম। যত ধরনের গরম মসলা ছিল সবই দিয়ে দিলাম। জ্বাল হতে থাকল।

মিজান বলল, খিচুড়ির আসল রহস্য হল মিক্সিং-এ। আপনি ভয় করবেন না। জিনিস ভালই দাঁড়াবে।

সে একটা খুন্তি দিয়ে প্রবল বেগে নাড়াতে শুরু করল। ঘন্টা দুয়েক পর যা দাঁড়াল তা দেখে বুকে কাঁপন লাগে। ঘন সিরাপের মত একটা তরল পদার্থ। উপরে আবার দুধের সরের মত সর পড়েছে। জিনিসটার রঙ দাঁড়িয়েছে ঘন কৃষ্ণ। মিজান শুকনো গলায় বলল, কালো হল কেন বলুন তো হুমায়ূন ভাই। কালো রঙের কিছুই তো দেইনি।

আমি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। মিজান বলল, টমেটো পেস্ট দিয়ে দেব নাকি?

ঃ দাও।

টমেটো পেস্ট দেয়ায় রঙ আরো কালচে মেরে গেল। মিজান বলল, লাল রঙয়ের কিছু ফুড কালার কিনে এনে ছেড়ে দেব?

ঃ দাও।

তাও দেয়া হল। এতে কালো রঙের কোন হেরফের হলো না। তবে মাঝে মাঝে লাল রঙ ঝিলিক দিতে লাগলো। দু'জনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। জাতীয় সংগীতেরও কোন ব্যবস্থা হল না। মিজানের গানের গলা আমার চেয়েও খারাপ। যখন গান ধরে মনে হয় গলায় সর্দি নিয়ে পাতিহাঁস ডাকছে। শিকাগো থেকে পানও এসে পৌঁছল না।

অনুষ্ঠান সন্ধ্যায়। বিকেলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হলো। অবাক হয়ে দেখি দূর দূর থেকে গাড়ি নিয়ে বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। শুনলাম মিজান নাকি আশপাশের যত ইউনিভার্সিটি আছে সব ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশ নাইটের খবর দিয়ে চিঠি দিয়েছিল। দেড় হাজার মাইল দূরে মন্টানো স্টেট ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে একটি মেয়ে গ্রে হাউণ্ড বাসে করে একা একা চলে এসেছে। মিনেসোটা থেকে এসেছে দশজনের একটা বিরাট দল। তারা সঙ্গে নানান রকম পিঠা নিয়ে এসেছে। গ্রাণ্ড ফোকস থেকে এসেছেন করিম সাহেব, তাঁর ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী। এই অসম্ভব কর্মঠ মহিলাটি এসেই আমাদের খিচুড়ি ফেলে দিয়ে নতুন খিচুড়ি বসালেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে সাউথ ডাকোটার ফলস স্প্রিং থেকে একদল ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত হল।

মিজান আনন্দে লাফাবে না চেঁচাবে কিছুই বুঝতে পারছে না। চুপচাপ বসে আছে, মাঝে মাঝে গম্ভীর গলায় বলছে —দেখ শালা বাংলাদেশ কী জিনিস। শালা দেখে যা।

অনুষ্ঠান শুরু হল দেশাত্মবোধক গান দিয়ে।

—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি ...।

অন্যান্য স্টেট থেকে মেয়েরা যারা এসেছে তাঁরাই শুধু গাইছে। এত সুন্দর গাইছে। এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে গান শুনে দেশের জন্যে আমার বুক হু-হু করতে লাগল। চোখে জল এসে গেল। কেউ যেন তা দেখতে না পায় সে জন্যে মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

পরদিন ফার্গো ফোরম পত্রিকায় বাংলাদেশ নাইট সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হল। খবরের অংশবিশেষ এ রকম--একটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ জাতির অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় দেশের গান দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম গান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশী ছেলেমেয়েরা সব কাঁদতে শুরু করল। আমি আমার দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা-জীবনে এমন মধুর দৃশ্য দেখিনি . . .।

কিসিং বুথ

আমেরিকানদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার গল্প বলার সময় কিসিং বুথের গল্পটা আমি খুব আগ্রহ করে বলি। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শোনে। যুবক বয়েসীরা গল্প শেষ হবার পর মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হয়ত-বা ভাবে, আহা তারা কী [illegible]ই না আছে।

গল্পটা বলা যাক।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে "হোম কামিং" বলে একটি উৎসব হয়। এই উৎসবে আনন্দ মিছিল হয়, হৈচৈ গান-বাজনা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচে সুন্দরী ছাত্রীটিকে হোম কামিং কুইন নির্বাচিত করা হয়। এই হোম কামিং রানীকে ঘিরে সারাদিন ধরে চলে আনন্দ-উল্লাস।

আমার আমেরিকাবাসের প্রথম বর্ষে হোম কামিং কুইন হল আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ক্লাসের এক ছাত্রী। স্পেনীশ আমেরিকান, রূপ ফেটে পড়ছে। কিছুক্ষণ এই মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে বুকের মধ্যে এক ধরনের হাহাকার জমে উঠতে থাকে, জগৎ-সংসার তুচ্ছ বোধ হয়। সম্ভবত এই শ্রেণীর রূপবতীদের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।

মেয়েটিকে নিয়ে ভোর এগারোটার দিকে একটা মিছিল বের হল। আমার ইচ্ছা করল মিছিলে ভীড়ে যাই। শেষ পর্যন্ত লজ্জা লাগল। ল্যাবরেটরীতে চলে এলাম। অনেকগুলি স্যাম্পল জমা হয়েছে। এদের এক্সরে ডিফ্রেকশান প্যাটার্ন জানাতে হবে। ডিফ্রেকশান মেশিনটা ভাল কাজ করছে না। ছবি পরিস্কার আসছে না। দুপুর একটা পর্যন্ত কাজ করলাম। ঠিক করে রাখলাম লাঞ্চ সারার জন্যে আধ ঘন্টার বিরতি দেব।

মেমোরিয়াল ইউনিয়নে লাঞ্চ খেতে গিয়েছি। লক্ষ্য করলাম মেমোরিয়াল ইউনিয়নের দোতলায় অস্বাভাবিক ভীড়। কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলাম।

জটলা আমাদের হোম কামিং কুইনকে ঘিরেই। এই রূপবতী বড় বড় পোস্টার সাজাচ্ছে। পোস্টারগুলিতে লেখা ঃ নীল তিমিরা আজ বিপন্ন। নীল তিমিদের বাঁচান।

জানা গেল এই হোম কামিং কুইন—নীল তিমিদের বাঁচও—সংঘের একজন কর্মী। সে আজ নীল তিমিদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে।

নীল তিমিদের ব্যাপারে আমি তেমন কোন আগ্রহ বোধ করলাম না। মানুষই যেখানে বিপন্ন সেখানে নীল তিমি নিয়ে লাফালাফি করার কোন অর্থ হয় না। তবু দাঁড়িয়ে আছি। রূপবতী মেয়েটির আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি দেখতে ভাল লাগছে।

আমি লক্ষ্য করলাম, কাঠগড়ার মত একটা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে লাল কালিতে ঠোঁটের ছবি এঁকে নিচে লেখা হল "কিসিং বুথ"—চুম্বন কক্ষ। তার নিচে লেখা চুমু খাবার নিয়মকানুন।

(১) জড়িয়ে ধরবেন না, মুখ বাড়িয়ে চুমু খান।

(২) চুমু খাবার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত।

(৩) প্রতিটি চুমু এক ডলার।

(৪) চেক গ্রহণ করা হবে না। ক্যাশ দিতে হবে।

(৫) বড় নোট গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাপারটা কী কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার পাশে দাঁড়ানো আমেরিকান ছাত্র বুঝিয়ে দিল।

হোম কামিং কুইন কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যরা তাকে চুমু খাবে এবং প্রতিটি চুমুতে এক ডলার করে দেবে। সেই ডলার চলে যাবে নীল তিমি বাঁচাও ফাণ্ডে।

আমি হতভম্ব।

প্রথমে মনে হল পুরো ব্যাপারটাই হয়ত এক ধরনের রসিকতা। আমেরিকানরা রসিকতা পছন্দ করে। এটাও বোধ হয় মজার রসিকতা।

দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়। মেয়েটি কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে লাইন। এক একজন এগিয়ে আসছে, ডলার দিচ্ছে, মেয়েটিকে চুমু খেয়ে সরে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় জন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি।

মেয়েটির মুখ হাসি হাসি। তার নীল চোখ ঝকমক করছে। যেন পুরো ব্যাপারটায় সে খুবই আনন্দ পাচ্ছে। আনন্দ ছেলেরাও পাচ্ছে। একজনকে দেখলাম দশ ডলারের একটা নোট দিয়ে পর পর দশবার চুমু খেল। এতেও তার স্বাদ মিটিল না। মানি ব্যাগ খুলে বিশ ডলারের আরেকটি নোট বের করে উঁচু করে সবাইকে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাত তালি, যার মানে চালিয়ে যাও।

ইউনিভার্সিটির মেথর, ঝাড়ুদার এরাও ডলার নিয়ে এগিয়ে এল। এরা বেশ গম্ভীর। যেন কোন পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে। চুমু খেল খুবই শালীন ভঙ্গিতে— মন্দিরের দেবীমূর্তিকে চুমু খাবার ব্যবস্থা থাকলে হয়ত এভাবেই খাওয়া হত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় ছাত্ররা চলে এল। এরা চুমু খাবার লাইনে দাঁড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাতে লাগল। এ ওকে ঠেলাঠেলি করছে। কেউ যেতে চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত একজন এগিয়ে এল, এর নাম উমেশ। বোম্বের ছেলে। মানুষ যে বানর থেকে এসেছে এটা উমেশকে দেখলেই বোঝা যায়। তার জন্যে ডারউইনের বই পড়তে হয় না। উমেশ চুমু খাবার পর পরই অন্য ভারতীয়দের লজ্জা ভেঙে গেল। তারাও লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ল্যাবোরেটরীতে চলে এলাম। আমার প্রফেসর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এক্সরের কাজ কী হচ্ছে তার খোঁজ নিতে এলেন। ডিফ্রেকশন প্যাটার্ন দেখতে দেখতে বললেন, তুমি কি ঐ মেয়েটিকে চুমু খেয়েছ?

আমি বললাম, না।

ঃ না কেন? মাত্র এক ডলারে এমন রূপবতী একটি মেয়েকে চুমু খাবার সুযোগ নষ্ট করা কি উচিত?

আমি বললাম, এভাবে চুমু খাওয়াটা আমাদের দেশের নীতিমালায় বাধা আছে।

ঃ বাধা কেন? চুমু হচ্ছে ভালবাসার প্রকাশ। তুমি যদি তোমার শিশুকন্যাকে প্রকাশ্যে চুমু খেতে পার তাহলে একটি তরুণীকে চুমু খেতে পারবে না কেন? মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ভালবাসা।

আমি বললাম, এই মেয়েটির ব্যাপারে তো ভালবাসার প্রশ্ন আসছে না।

তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, আসবে না কেন? এই মেয়েটিকে তুমি হয়ত ভালবাসছ না, কিন্তু তার রূপকে তুমি ভালবাসছ। বিউটি ইজ ট্রুথ। তাই নয় কি?

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, একটি নির্জন দ্বীপে যদি তোমাকে ঐ মেয়েটির সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হত তাহলে তুমি কী করতে? চুপ করে বসে থাকতে?

আমি নিচু গলায় বললাম, মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।

অধ্যাপক বিরক্ত গলায় বললেন, এর মানে কি?

আমি ইংরেজীতে তাঁকে ব্যাখ্যা করে দিলাম। অধ্যাপক পরম প্রীত হলেন।

আমি বললাম, তুমি কি চুমু খেয়ে এসেছ?

ঃ না। এখন ভীড় বেশি। ভীড়টা কমলেই যাব।

বিকেল চারটায় এক্সরে টেকনিশিয়ান ছুটে এসে বলল, বসে আছো কেন? এক্ষুণি মেমোরিয়েল ইউনিয়নে চলে যাও। কুইক। কুইক।

ঃ কেন?

ঃ চারটা থেকে চারটা ত্রিশ, এই আধঘন্টার জন্যে চুমুর দাম কমানো হয়েছে। এই আধঘন্টার জন্যে ডলারে দুটো করে চুমু।

টেকনিশিয়ান যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিল তেমনি ঝড়ের গতিতেই চলে গেল। আমি গেলাম দেখতে। লাইন এখনও আছে। লাইনের শুরুতেই উমেশকে দেখা গেল। সে মনে হয় লাইনে লাইনেই আজকের দিনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। আমার প্রফেসরকেও দেখলাম। এক ডলারের একটা নোট হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে দেখে হাত ইশারা করে ডাকলেন।

গল্পটা আমি এই জায়গাতে শেষ করে দেই। শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চায়, আপনি কি করলেন? দাঁড়ালেন লাইনে?

আমি তাদের বলি, আমি লাইনে দাঁড়ালাম কি দাঁড়ালাম না, তা মূল গল্পের জন্যে অনাবশ্যক।

ঃ অনাবশ্যক হোক আর না হোক, আপনি দাঁড়ালেন কি না বলুন।

আমি কিছুই বলি না। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসি। যে হাসির দু'রকম অর্থই হতে পারে।

প্রথম তুষারপাত

ভিসকোমিটারটা ঠিকমত কাজ করছিল না। একেক সময় একেক রকম রিডিং দিচ্ছে। আমার সঙ্গে কাজ করে পাল রেইমেন। ভিসকোমিটার কাজ করছে না শুনে সে কোত্থেকে লম্বা একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে এল এবং পটপট করে ভিসকোমিটারের সব অংশ খুলে ফেলল। আমি মনে মনে বললাম, বাহ্ বেশ ওস্তাদ ছেলে তো। এত জটিল যন্ত্র অথচ কী অবলীলায় খুলে ফেলল।

আমি বললাম, পল ! তুমি কি এই যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জান?

পল বলল, না !

আমি অবাক হয়ে বললাম, জান না তাহলে এটা খুলে ফেললে যে?

ঃ দেখি ব্যাপারটা কী?

পল ভিসকোমিটারের স্প্রীং খুলে বের করে আনল এবং দু'হাতে কিছুক্ষণ টানাটানি করে বলল—এটা গেছে। বলেই স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে উঠে চলে গেল। আমি টেবিলের উপর একগাদা যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। কী করব কিছু বুঝতে পারলাম না।

আমেরিকানদের এই বিচিত্র অভ্যাসটি সম্পর্কে বলা দরকার। আমি এর নাম দিয়েছি স্ক্রু ড্রাইভার প্রেম। সব আমেরিকানদের পকেটে কয়েক সাইজের স্ক্রু ড্রাইভার থাকে বলে আমার ধারণা। প্রথম সুযোগেই এরা সমস্ত স্ক্রু খুলে ফেলবে।

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের ভীতি আছে। ভীতির কারণ আমাদের শৈশব। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি—বাড়িতে হয়ত একটা রেডিও আছে। ছোট ছেলে রেডিও ধরতে গেল। বাবা চেঁচিয়ে উঠবেন, খবরদার হাত দিবি না। মা চেঁচাবেন, খোকন হাত দিও না, ব্যথা পাবে। ছোট্ট খোকনের মনের ভেতর ঢুকে গেল যন্ত্রপাতিতে হাত দেয়া যাবে না। হাত দিলেই খারাপ কিছু ঘটে যাবে। বড় হবার পরেও শৈশবের স্মৃতি থেকেই যায়। ঘরের ফিউজ কেটে গেলেও আমরা একজন মিস্ত্রি ডেকে আনি।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি—টেবিলে যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে বসে আছি। মনটা খারাপ, এইসব খুঁটিনাটি জোড়া লাগাব কীভাবে তাই ভাবছি। তখন পল

আবার ঘরে ঢুকল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, তাড়াতাড়ি বাইরে যাও, তুষারপাত হচ্ছে।

আমাদের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বর্ষা। মেঘমেদুর আকাশ। শ্রাবণের ধারা। আষাঢ়ের পূর্ণিমা। তেমনি ইংরেজী সাহিত্যে আছে তুষারপাত। বিশেষ করে বছরের প্রথম তুষারপাতের বর্ণনা। বছরের প্রথম বৃষ্টি বলে আমাদের কিছু নেই। সারা বছরই বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষাকালে বেশি, অন্য সময় কম।

এদেশে তুষারপাতের নির্দিষ্ট সময় আছে। সামারে তুষারপাত হবে না। স্প্রীং বা ফলেও হবে না। তুষারপাত হবে শীতের শুরুতে। এবং প্রথম তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে দীর্ঘ শীতের প্রস্তুতি। ফায়ারিং প্লেস ঠিক করতে হবে। হিটিং সিস্টেম ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। শীতের দিনের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা দেখতে হবে। দিনের পর দিন ঘর বন্দী হয়ে থাকতে হবে, তার জন্যও প্রস্তুতি দরকার। ব্লিজার্ড হতে পারে। ব্লিজার্ড হলে ছ'সাত দিন একনাগাড়ে গৃহবন্দী থাকতে হবে। তারও প্রস্তুতি আছে। দেখতে হবে সেলারে প্রচুর মদের বোতল আছে কি না। পছন্দসই বিয়ারের পেটি ক'টা আছে। শীতের সিজনে স্কীইং করার পরিকল্পনা থাকলে তার জন্যও প্রস্তুতি দরকার। অনেক কাজ। সব কাজের শুরুর ঘটা হচ্ছে বছরের প্রথম তুষার।

তুষারপাত দেখবার জন্যে ডানবার হলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। আকাশ ঘোলাটে। বইপত্রে পড়েছি পেঁজা তুলার মত তুষার পড়ে। এখন সে রকম দেখলাম না, পাউডারের কণার মত গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার পড়ছে। গায়ে পড়া মাত্রই তা গলে যাচ্ছে। খুব যে একটা অপরূপ দৃশ্য তা নয়। তবুও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।

দেখতে দেখতে পট পরিবর্তন হলো। শিমুল তুলার মত তুষার পড়ছে। মনে হচ্ছে মেঘের টুকরো। এই টুকরোগুলি গায়ে পড়া মাত্র গলে যাচ্ছে না। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকছে। চেনা এই জায়গা মুহূর্তের মধ্যে অচেনা হয়ে গেল। যেন এটা ডানবার হলের সামনের জায়গা নয়। এটা ইন্দ্রলোকের কোন-এক মেঘপুরী।

মাত্র দু'ঘন্টা সময়ে সমস্ত ফার্গো শহর তুষারে ঢাকা পড়ে গেল। চারদিক সাদা। এই সাদা রঙের কী বর্ণনা দেব? তুষারের সাদা রঙ অন্য সাদার মত নয়। এই সাদা রঙে একটা হিম ভাব থাকে যা ঠিক কাছে টানে না, একটু যেন দূরে সরিয়ে দেয়। তুষারের শুভ্রতার সঙ্গে অন্য কোন শুভ্রতার তুলনা চলে না। এই শুভ্রতা অপার্থিব।

ল্যাবরেটরী বন্ধ করে সকাল সকাল হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরছি। বাস নিলাম না। তুষারের রূপ দেখতে দেখতে যাবো। মাইল দু'এক পথ। কতক্ষণ আর লাগবে?

পথে নেমেই বুঝলাম খুব বড় বোকামি করেছি। রাস্তা অসম্ভব পিছল। পা ফেলা যায় না, তার উপর ঠাণ্ডা। টেম্পারেচার দ্রুত নেমে যাচ্ছে। গায়ে সেই অনুপাতে গরম কাপড় নেই। ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাচ্ছি। তবু ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী বরফের চাদরে ঢাকা। নিজেকে মনে হচ্ছে ক্যাপটেন স্কট— এগুচ্ছি মেরুবিন্দুর খোঁজে। চারদিকের কী অপরূপ দৃশ্য। সুন্দর! সুন্দর!! সুন্দর!!! আবেগে ও আনন্দে আমার চোখ ভিজে উঠল।

"Winter for a moment takes the mind ; the snow
Falls past the archlight ; icicles guard a wall ;
The wind moans through a crack in the window
A keen sparkle of frost is no the sill"

জননী

ছোট বেলায় আমার ঘর-পালানো রোগ হয়েছিল।

তখন ক্লাস থ্রীতে পড়ি। স্কুলের নাম কিশোরীমোহন পাঠশালা। থাকি সিলেটের মীরাবাজারে। বাসার কাছেই স্কুল। দুপুর বারোটায় স্কুল ছুটি হয়ে যায়। বাকি দীর্ঘ সময় কিছুতেই আর কাটে না। আমার বোনেরা তখন রান্নাবাটি খেলে। ওদের কাছে পাত্তা পাই না। মাঝে মাঝে অবশ্যি খেলায় নেয়, তখন আমার ভূমিকা হয় চাকরের। আমি হই পুতুল খেলা সংসারের চাকর। ওদের ফাইফরমায়েশ খাটি। ওরা আমার সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলে। কাজেই ওদের পুতুল খেলায় খুব উৎসাহ বোধ করি না।

ঘর-পালানো রোগ তখন হলো। এক ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। চমৎকার অভিজ্ঞতা। হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত সব কল্পনা করা যায়। মজার মজার দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ানো যায়। কারো কিছু বলার থাকে না।

আমি রোজই তা-ই করি। সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ফিরে আসি। আমার মা নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর ছেলে যে সারা দুপুর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তা-ও তিনি জানেন না। আর জানলেও যে ভয়ংকর কিছু করতেন তা-ও মনে হয় না। তাঁর দিবানিদ্রায় আমি ব্যাঘাত করছি না—এই আনন্দটাই তাঁর জন্য অনেকখানি ছিল বলে আমরা ধারণা।

যাই হোক, একদিনের ঘটনা বলি। হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটা বাড়ির বারান্দায় এসে বসলাম। কালো সিমেন্টের বারান্দা। দেখলেই ইচ্ছে করে খালি গায়ে শুয়ে পড়তে। চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ বাড়ির দরজা খুলে গেল। ঘুমঘুম চোখে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। নরম গলায় বললেন, কী চাও খোকা?

আমি বললাম, কিছু চাই না।

ঃ বাসা কোথায়?

আমি জবাব দিলাম না। বাসা কোথায় তা এই মহিলাকে বলার কোন অর্থ হয় না। তিনি চলে গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখে গভীর বিস্ময়

এবং কৌতূহল। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তিনি বললেন, তুমি চলে যেও না, আমি আসছি।

তিনি ঘরের ভিতরে চলে গেলেন এবং মিনিট তিনেক পর আবার উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে কী-একটা খাবার। তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন—নাও, খাও।

অপরিচিত কেউ কিছু খেতে দিলে বলতে হয়—খাব না। ক্ষিধে নেই। আমি তা বলতে পারলাম না। জিনিসটা হাতে নিলাম। খেতে গিয়ে বুঝতে পারলাম ঐ খাদ্য এই পৃথিবীর খাদ্য নয়। স্বর্গীয় কোন অমৃত।

জিনিসটা হচ্ছে জেলী মাখানো এক টুকরো পাউরুটি। এরকম সুখাদ্য পৃথিবীতে আছে এবং তা অপরিচিত কাউকে দেয়া যায় তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, আরেকটা দেব?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম, তবে তা করতে বড় কষ্ট হল। ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন এবং আরো এক টুকরা পাউরুটি নিয়ে ফিরে এলেন।

আমি দ্বিতীয়টিও নিঃশব্দে খেয়ে ফেললাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, তোমার নাম কী, খোকা?

আমি নাম বললাম না। এক দৌড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম। তিনি নিশ্চয়ই আমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছিলেন, তবে তিনি হয়ত-বা তার চেয়েও অবাক হলেন যখন দেখলেন পরের দিন আমি আবার উপস্থিত হয়েছি।

তিনি আমাকে দেখে খুব হাসলেন। তারপরই খাবার নিয়ে এলেন। ব্যাপারটা রুটিনের মত হয়ে গেল—আমি রোজ যাই, ভদ্রমহিলা খাবার দেন, আমি খাই এবং চলে আসি।

তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করেন বলে মনে হয়। বারান্দায় এসে বসা মাত্র দরজা খুলে বের হয়ে আসেন।

একদিনের কথা বলি। মেঘলা দুপুর। চারদিকে কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভদ্রমহিলার বারান্দায় পা দেয়া মাত্র বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল।

তিনি দরজা খুলে বললেন, বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট আসবে, ভেতরে এসো খোকা।

আমি ভুয়ে ভয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালাম। কী চমৎকার সাজানো বাড়ি। যেন ছবি আঁকা। মানুষের বাড়ির ভেতরটা এত সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না।

ঃ খোকা, বস।

আমি ভয়ে ভয়ে সোফায় বসলাম। তিনি বললেন, আজ থেকে তুমি আমাকে

মা বলে ডাকবে, কেমন? তুমি মা ডাকবে, আমি তোমাকে খুব মজার মজার খাবার খাওয়াব। আচ্ছা?

আমি কিছু বললাম না।

তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে মা ডাকছ এটা কাউকে বলার দরকার নেই। এটা তোমার এবং আমার গোপন খেলা।

আমি ভদ্রমহিলার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তিনি নাশপাতি কিংবা নাশপাতির মত দেখতে কোন একটা ফল কেটে দিলেন। বললেন, এসো, তুমি আমার কোলে বসে খাও। তার আগে মিষ্টি করে আমাকে মা ডাক তো।

আমি মা ডাকতে পারলাম না। বিচিত্র এক ধরনের ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠল। শিশুদের মনের গভীরে অনেক ধরনের ভয় লুকানো থাকে। তারই কোন একটা বের হয়ে এসে আমাকে অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে বের হয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় পৌঁছলাম।

ঐ রহস্যময় বাড়িতে আর কোনদিন যাইনি। মানুষের জীবনে কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রহস্যময় প্রকৃতি মানুষকে একই পরিস্থিতিতে বার বার ফেলে মজা দেখেন বলে আমার ধারণা। সিলেটের ঐ বাড়ির মহিলার মত এক মহিলার দেখা পেলাম খোদ আমেরিকায়। আমার বয়স তখন সাতাশ।

শীতের শুরু।

বরফ পড়া আরম্ভ হয়েছে। হোটেল গ্রেভার ইন থেকে বাসে ইউনিভার্সিটিতে আসতে খুব কষ্ট হয়। বাসের ভিতর হিটিং-এর ব্যবস্থা আছে, তবু শীতে জমে যাবার মত কষ্ট পাই। বাসস্ট্যাণ্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করার কষ্টও অকল্পনীয়। আমার ভারতীয় বন্ধু উমেশ আমার জন্য ইউনিভার্সিটির কাছে একটা ঘর খুঁজে দিল।

আমেরিকান এক ভদ্রমহিলা তার বাড়ির কয়েকটা ঘর বিদেশী ছাত্রদের ভাড়া দেন। ভাড়া খুবই সস্তা, মাসে চল্লিশ ডলার। তবে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে বাইরে। আমি বাড়িওয়ালির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর নাম লেভারেল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, আমি খুব বেছে বেছে রুম ভাড়া দেই। যাদেরকে দেই তাদের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। তার মধ্যে সবচে কঠিন নিয়ম দুটি হচ্ছে, রাত দশটার পর কোন বান্ধবীকে ঘরে আনা যাবে না। এবং উঁচু ভ্যলুমে স্টেরিও বাজানো যাবে না।

আমি বললাম, বান্ধবী এবং স্টেরিও—দুটোর কোনটিই আমার নেই।

তিনি বললেন, এখন নেই, দুদিন পর হবে। সেটা দোষের নয়। তবে আমার নিয়ম তোমাকে বললাম। পছন্দ হলে রুম নিতে পার।

আমি রুম নিয়ে নিলাম। প্রথম মাসের ভাড়া বাবদ চল্লিশ ডলার দেবার পর তিনি একটি ছাপানো কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। সেই কাগজে আরো সব শর্ত লেখা। প্রথম শর্ত পড়েই আমার আক্কেল গুড়ুম। লেখা আছে ঃ এই বাড়ির কোন অগ্নিবীমা নেই। কাজেই এই বাড়ির অধিবাসীদের কেউ ধূমপান করতে পারবে না।

সব নিয়ম মানা সম্ভব কিন্তু এই নিয়ম কী করে মানব? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। একবার ভাবলাম ডলার ফেরত নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরে যাব। আবার ভাবলাম, বাসায় তো আর বেশিক্ষণ থাকব না, কাজেই তেমন অসুবিধা হয়ত হবে না।

অসুবিধা হল।

ঘুমুতে যাবার আগে আগে সিগারেটের তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাবার মত অবস্থা হল। আমি গরম কাপড় গায়ে দিলাম। গায়ে পার্কা চড়ালাম। মাফলার দিয়ে নিজেকে পেঁচিয়ে মাংকিক্যাপ মাথায় দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে সিগারেট ধরালাম।

দৃশ্যটা অদ্ভুত। বরফ পড়ছে। এই বরফের মধ্যে জোব্বা-জাব্বা গায়ে এক ছেলে সিগারেট টানার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

দিন সাতেক পরের কথা। লেভারেল আমার ঘরে ঢুকে কঠিন গলায় বলল, এগারটা-বারটার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টান তাই না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ ধূমপান যারা করে তাদের আমি বাড়ি ভাড়া দেই না।

ঃ আমি সামনের মাসে চলে যাব।

ঃ খুবই ভাল কথা। মাসের এই কটা দিন দয়া করে ঘরে বসেই সিগারেট খাবে। ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে অসুখ-বিসুখ বাঁধাও তা আমি চাই না।

ঃ ধন্যবাদ।

ঃ শুকনো ধন্যবাদের আমার দরকার নেই। আমি পনেরো বছরে এই প্রথম একজনকে সিগারেট খাবার অনুমতি দিলাম।

ঃ থ্যাংক ইউ।

লেভারেল উঠে চলে গেল। তবে যাবার আগে হঠাৎ বলল, তোমার অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই। তুমি আমার এখানেই থাকবে। আমি তোমার সিগারেটের অভ্যাস ছাড়িয়ে দেব।

ভদ্রমহিলা এর পর আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। আমার সিগারেটের প্যাকেট তাঁর কাছে জমা রাখতে হল। তিনি গুনে গুনে আমাকে সিগারেট দেন। তাঁর সামনে বসে খেতে হয়। তিনি নানান উপদেশ দেন, ধোঁয়া বুকের ভিতর নিও না। পাফ করে ছেড়ে দাও।

সিগারেট খাবার সময় একজন অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এটা অসহ্য।

এছাড়াও তিনি আরো সব সমস্যা করতে লাগলেন—আমার ওজন খুব কম, কাজেই তিনি ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। বলতে গেলে রোজ রাতে তার সঙ্গে ডিনার খেতে হয়। তিনি আমার কাপড় ধুয়ে দেন। ঘর ঝাঁট দিয়ে দেন। একদিন তুষার ঝড় হচ্ছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ঠিকমত ফিরতে পারব না ভেবে নিজেই ইউনিভার্সিটিতে হাজির হলেন। আমি বরফের উপর দিয়ে ঠিকমতই হাঁটতে পারছি তবু তিনি হাত ধরে আমাকে নিয়ে এলেন।

বরফের উপর দিয়ে দুজন আসছি। হঠাৎ উনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, হুমায়ূন [ইনিই একমাত্র আমেরিকান যিনি শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করতেন] তুমি কি দয়া করে এখন থেকে আমাকে মা ডাকবে?

আমি স্তম্ভিত।

বলেন কী এই মহিলা!

আমি চুপ করে রইলাম। লেভারেল শান্ত গলায় বললেন, তুমি আমাকে মা ডাকলে আমার খুব ভাল লাগবে। সব সময় ডাকতে হবে না। এই হঠাৎ হঠাৎ।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। আমাদের মধ্যে আর কোন কথা হল না।

আমি বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলাম।

ভদ্রমহিলার আদরযত্নে খুব অস্বস্তি বোধ করি। কেউ আমার প্রতিটি ব্যাপার লক্ষ্য রাখছে তাও আমার ভাল লাগে না।

আমি পড়াশুনা করি, তিনি চুপচাপ পাশে বসে থাকেন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, আমি পাশে বসে থাকায় কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে? আমি ভদ্রতা করে বলি "না"।

ঠাণ্ডা লেগে একবার খানিকটা জ্বরের মত হল, তিনি তাঁর নিজের ইলেকট্রিক ব্ল্যাংকেট আমাকে দিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে একটা কার্ড, সেখানে লেখা : তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। তোমার মা—লেভারেল।

ভদ্রমহিলার এখানে বেশিদিন থাকতে হলো না। ইউনিভার্সিটি আমাকে বাড়ি দিল। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বিদায়ের সময় তিনি শিশুদের মত চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী বিরক্ত হয়ে বারবার বললেন, এসব কী হচ্ছে? ব্যাপারটা কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। লেভারেল, তুমি এত আপসেট কেন?

আমার হৃদয় খুব সম্ভব পাথরের তৈরি। এই দুজনের কাউকেই আমি মুখ ফুটে মা ডাকতে পারিনি।

এই পরবাসে

অকর্মা লোক খুব ভাল চিঠি লিখতে পারে বলে একটা প্রবচন আছে। অকর্মাদের কাজকর্ম নেই—ইনিয়ে-বিনিয়ে দীর্ঘ চিঠি তাদের পক্ষেই লেখা সম্ভব।

আমি নিজেও এইসব অকর্মাদের দলে। গুছিয়ে চিঠি লিখবার ব্যাপারে আমার জুড়ি নেই। পাঠকরা হয়ত ভুরু কুঁচকে ভাবছেন—এই লোকটা দেখি খুব অহংকারী।

তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমি আসলেই অহংকারী, তবে লিখিতভাবে সেই অহংকার কখনো প্রকাশ করিনি। আজ করলাম। আমি যে চমৎকার চিঠি লিখতে পারি তার এখন একটি প্রমাণ দেব। আমার ধারণা, যে-সব পাঠক এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে ছিলেন—প্রমাণ দাখিলের পর তাঁদের মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

প্রবাস জীবনের সাত মাস পার হয়েছে। আমার স্ত্রী গুলতেকিন আমার সঙ্গে নেই। সে আছে দেশে। হলিক্রস কলেজ থেকে আই-এস-সি পরীক্ষা দেবে। কোমর বেঁধে পড়াশোনা করছে। পরীক্ষার আর মাত্র মাস খানেক দেরি। এই অবস্থায় আমি আমার বিখ্যাত চিঠিটি লিখলাম। চার পাতার চিঠিতে একা থাকতে যে কী পরিমাণ খারাপ লাগছে, তার প্রতি যে কী পরিমাণ ভালবাসা জমা করে রেখেছি এইসব লিখলাম। চিঠির শেষ লাইনে ছিল—আমি এনে দেব তোমার উঠোনো সাতটি অমরাবতী।

এই চিঠি পড়ে সে খানিকক্ষণ কাঁদল। পরীক্ষা-টরীক্ষার কথা সব ভুলে গিয়ে সাত মাস বয়েসী শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে চলে এল আমেরিকায়। আমি আমার চিঠি লেখার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত। পরীক্ষা-টরীক্ষা সব ফেলে দিয়ে চলে আসায় আমি খানিকটা বিরক্ত। দু মাস অপেক্ষা করে পরীক্ষা দিয়ে এলেই হত।

গুলতেকিন চলে আসায় আমার জীবনযাত্রা বদলে গেল। দেখা গেল সে একা আসেনি, আমার জন্যে কিছু সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে, সে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি আমাকে একটা বাড়ি দিল।

দু'তলা বাড়ি। এক তলায় রান্নাঘর, বসার ঘর এবং স্টাডি রুম। দুতলায় দুটি শোবার ঘর। এত বড় বাড়ির আমার প্রয়োজন ছিল না। ওয়ান বেডরুমই যথেষ্ট ছিল। তবে নর্থ ডাকোটা স্টেটের নিয়ম হচ্ছে বাচ্চার জন্যে আলাদা শোবার ঘর

থাকতে হবে। বাচ্চাদের মধ্যে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে হলে তাদের জন্যে আলাদা আলাদা শোবার ঘর থাকতে হবে। তবে দু'জনই ছেলে বা মেয়ে হলে একটি শোবার ঘরেই চলবে।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এলাম। বলতে গেলে প্রথমবারের মত আমার সংসার শুরু করলাম। এর আগে থেকেছি মা-র সংসারে। আলাদা সংসারের আনন্দ বেদনার কিছুই জানি না। প্রবল উৎসাহে আমরা ঘর সাজাবার কাজে লেগে পড়লাম। রোজই দোকানে যাই। যা দেখি তাই কিনে ফেলি। এমন অনেক জিনিস আমরা দুজনে মিলে কিনেছি যা বাকি জীবনে একবারও ব্যবহার হয়নি। এই মুহূর্তে দুটি জিনিসের নাম মনে পড়ছে—টুল বক্স, যেখানে করাত-ফরাত সবই আছে। এবং ফুট বাথ নেবার জন্যে প্লাস্টিকের গামলা জাতীয় জিনিস।

গুলতেকিন প্রবল উৎসাহে রান্নাবান্না নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাত মাছ ছাড়াও নানান পরীক্ষামূলক রান্না হতে লাগল। অতি অখাদ্য সেই সব খাদ্যদ্রব্য মুখে নিয়ে আমি বলতে লাগলাম, অপূর্ব।

খুব সুখের জীবন ছিল আমাদের। সাত মাস বয়সের পুতুলের মত একটি মেয়ে যে কাউকে বিরক্ত করে না, আপন মনে খেলে। মাঝে মাঝে তার মনে গভীর ভাবের উদয় হয় সে তার নিজস্ব ভাষায় গান গায়—

গিবিজি গিবিজি, গিবিজি গিবিজি
গিবি॥
গিবিজি গিবিজি গিবিজি গিবিজি
গিবি॥

আহা, সে বড় সুখের সময়।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই দেশে প্রবাসী ছাত্রদের স্ত্রীরা ভয়াবহ জীবন যাপন করেন। এদের কিছুই করার থাকে না। স্বামী কাজে চলে যায়, ফেরে গভীর রাতে। এই দীর্ঘ সময় বেচারীকে কাটাতে হয় একা একা। এরা সময় কাটায় টিভির সামনে বসে থেকে কিংবা শফিং মলে ঘুরে ঘুরে।

রাতে স্বামী যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে তখন অতি অল্পতেই খিটিমিটি লেগে যায়। স্ত্রী বেচারীর ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম যিনি রাত একটায় তাঁর স্ত্রীকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। একবারও ভাবেননি এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আত্মীয়-পরিজনহীন শহরে মেয়েটি কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে।

যাক ওসব, নিজের গল্পে ফিরে আসি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলাম, প্রবাসী জীবনে আমি কখনো আমার স্ত্রীর উপর রাগ করব না। কখনো তাকে একাকীত্বের কষ্ট পেতে দেব না।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আঠারো বছরের এই মেয়ে আমেরিকান জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে খুব সহজেই মানিয়ে নিচ্ছে। অতি অল্প সময়ে সে চমৎকার ইংরেজী বলা শিখল। সুন্দর একসেন্ট। আমি অবাক হয়ে বললাম, এত চমৎকার ইংরেজী কোথায় শিখলে?

সে বলল টিভি থেকে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ১৪ ঘন্টা টিভি খোলা থাকে। ইংরেজী শিখব না তো করব কি?

একদিন বাসায় এসে দেখি ফুটফুটে চেহারার দু'টি আমেরিকান বাচ্চা আমার মেয়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছে। অবাক হয়ে বললাম, এরা কারা?

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল, বেবী সিটিং শুরু করেছি।

ঃ সে কি?

ঃ অসুবিধা তো কিছু নেই। আমার নিজের বাচ্চাটিকে তো আমি দেখছি, এই সঙ্গে এই দু'জনকেও দেখছি। আমার তো সময় কাটাতে হবে।

গুলতেকিন খুবই অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। ওদের ধানমণ্ডির বাসায় আমি প্রথম কাপড় ধোয়া এবং কাপড় শুকানোর যন্ত্র দেখি। ওদের পরিবারে ম্যানেজার জাতীয় একজন কর্মচারী আছে, তিনজন আছে কাজের মানুষ। ড্রাইভার আছে, মালী আছে। এদের প্রত্যেকের আলাদা শোবার ঘর আছে। এরা যেন নিজেরা রান্না-বান্না করে খেতে পারে সে জন্যে আলাদা রান্নাঘর এবং বাবুর্চি আছে।

সেই পরিবারের অতি আদরের একটি মেয়ে বেবী সিটিং করছে। ভাবতেও অবাক লাগে। কাজটা হচ্ছে আয়ার। এই জাতীয় কাজের মানসিক প্রস্তুতি নিশ্চয়ই তার ছিল না। বিদেশের মাটিতে সবই বোধহয় সম্ভব। বেবী সিটিং-এর কাজটি সে চমৎকারভাবে করতে লাগল। বাসা ভর্তি হয়ে গেল বাচ্চায়। সবাই গুলতেকিনকে বেবী সিটার হিসেবে পেতে চায়।

মাঝে মাঝে দুপুরে বাসায় খেতে এসে দেখি পুরোপুরি স্কুল বসে গেছে। বাড়ি ভর্তি বাচ্চা। তারা আমার মেয়ের দেখাদেখি গুলতেকিনকে ডাকে আম্মা, আমাকে ডাকে আব্বা।

মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে আমেরিকান দম্পতি দুপুর রাতে তাদের বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত। লজ্জিত গলায় বলছে, আমার বাচ্চাটা চেঁচামেচি করছে রাতে তোমার

সঙ্গে ঘুমুবে। কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। আমরা খুবই লজ্জিত। কী করব বুঝতে পারছি না।

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল—বাচ্চাকে রেখে যান।

ঃ এর জন্যে আমি তোমাকে পে করব।

ঃ পে করতে হবে না। রাতের বেলা তোমার বাচ্চা আমার গেস্ট।

গুলতেকিন শুয়েছে, একদিকে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে আমাদের নিজের মেয়ে নোভা। অন্যদিকে আমেরিকান বাচ্চা। চমৎকার দৃশ্য।

টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে আমি যত টাকা পেতাম সে তারচে অনেক বেশি পেতে লাগল। আমরা চমৎকার একটা গাড়ি কিনলাম—ডজ কোম্পানির পোলারা।

ছুটির দিনগুলিতে গাড়ি করে ঘুরে বেড়াই। প্রায়ই মনে হয় আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়টা কাটাচ্ছি।

টাকা-পয়সা নিয়ে আমরা যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করি, সুখের উপকরণগুলির মধ্যে টাকা-পয়সার ভূমিকাটা বেশ বড়। যতই দিন যাচ্ছে ততই তা বুঝতে পারছি। কিংবা কে জানে ধনবাদী এই সমাজ আমার চিন্তা-ভাবনাকে পাল্টে দিতে শুরু করেছে কিনা।

পরবাসে আমার রুটিনটা হল এরকম ঃ ভোরবেলা ল্যাবরেটরীতে চলে যাই। সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি। ঘরে পা দেবার পর ক্লাসের বইপত্র ছুঁয়েও দেখি না। টিভি চালিয়ে দেই, গান শুনি, লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আসা গাদা গাদা গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাই। নোভাকে বাংলা শেখাতে চেষ্টা করি। গ্লাসের পানি দেখিয়ে বলি—এর নাম পানি। বল, পানি

সে বলে, গিবিজি।

ঃ গিবিজি নয়। বল পানি প-া-ন-ি..

ঃ গিবিজি, গিবিজি।

মেয়েটিকে নিয়ে তার মা খুব দুশ্চিন্তায় ভোগে। শুধুমাত্র গিবিজি শব্দ সম্বল করে সে এই পৃথিবীতে এসেছে কিনা কে জানে। তার দেড় বছর বয়স হয়ে গেছে, এই বয়সে বাচ্চারা চমৎকার কথা বলে। অথচ সে শুধু বলে—গিবিজি। আমি নিজেও খানিকটা চিন্তিত বোধ করলাম।

দু'বছর বয়সে হঠাৎ করে সে কথা বলতে শুরু করল। ব্যাপারটা বেশ মজার, কারণ সে কথা বলা শুরু করল ইংরেজীতে। একটা দুটা শব্দ নয়, প্রথম থেকে বাক্য। এবং বেশ দীর্ঘ বাক্য। বাসায় দুটো ভাষা চালু ছিল—ইংরেজী ও বাংলা। আমরা নিজেরা বাংলা বলতাম। যে সব বাচ্চারা সারাদিন বাসায় থাকত তারা বলত

ইংরেজি। সে দুটি ভাষাই দীর্ঘদিন লক্ষ্য করেছে। বেছে নিয়েছে একটি। ভাষা বিজ্ঞানীদের জন্যে এই তথ্যটি সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ।

আমার দীর্ঘ সাত বছরের প্রবাস জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের গল্প আছে। সবই ব্যক্তিগত গল্প। তার থেকে দু একটি বলা যেতে পারে।

একদিনের কথা বলি। সন্ধ্যা মিলিয়েছে [বলে রাখা ভাল সামারে সন্ধ্যা হয় রাত ন টার দিকে]। আমি পোর্চে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ন'দশ বছরের একটি বালিকা আমার বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। মেয়েটির চেহারা ডল পুতুলের মত। ফ্রকের হাতায় সে চোখ মুছছে। আমি বললাম, কী হয়েছে খুকী।

সে বলল, কিছু হয়নি। আমি কি তোমার বাসার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি?

ঃ অবশ্যই পারো। ভেতরে এসেও বসতে পার।

ঃ না। আমার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে।

রাত সাড়ে দশটায় খাবার শেষ করে বাইরে এসে দেখি মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, এখনো দাঁড়িয়ে আছো?

সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি তো তোমাকে বিরক্ত করছি না। শুধু দাঁড়িয়ে আছি।

ঃ ব্যাপারটা কি তুমি আমাকে বলবে?

মেয়েটি ঘটনাটা বলল।

তার মা একজন ডিভোর্সি মহিলা। মেয়েকে নিয়ে থাকে। সম্প্রতি একটি ছেলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ছেলেটিকে নিয়ে সে ডেটিং-এ যায়। মেয়েটিকে একা বাড়িতে রেখে যায়। সন্ধ্যা মেলাবার পর মেয়েটির একা একা ভয় করতে থাকে। সে তখন ঘর বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ায়। মায়ের জন্য অপেক্ষা করে। আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে আমার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত বাতি জ্বলে। সে লক্ষ্য করেছে আমি খুব রাত জাগি।

মেয়েটির কষ্টে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, খুকী তুমি আমার ঘরে এসে মার জন্য অপেক্ষা কর।

সে কঠিন গলায় বলল, না।

সেবারের পুরো সামারটা আমার নষ্ট হয়ে গেল। মেয়েটি রোজ গভীর রাত পর্যন্ত আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মার জন্যে অপেক্ষা করে। ভদ্রমহিলা মধ্যরাতে মাতাল অবস্থায় ফেরেন। আমার ইচ্ছা করে চড় দিয়ে এই মহিলার সব

কটি দাঁত ফেলে দেই। তা করতে পারি না। কান পেতে শুনি মহিলা তার মেয়েকে বলছেন—আর কখনো দেরি হবে না। তুমি কি খুব বেশি ভয় পাচ্ছিলে?

ঃ না।

ঃ আমি তোমাকে ভালবাসি, মা।

ঃ আমিও তোমাকে ভালবাসি।

আই লাভ ইউ—কথাটি একজন আমেরিকান তাঁর সমগ্র জীবনে কত লক্ষ বার ব্যবহার করেন আমার জানতে ইচ্ছে করে। এই বাক্যটির আদৌ কি কোন অর্থ তাদের কাছে আছে?

আরেকটা ঘটনা বলি।

আমার স্ত্রী জেনিলী নামের একটি মেয়ের বেবী সিটিং করতো। মেয়েটির বয়স সাত-আট বছর। মেয়েটির মা একজন ডিভোর্সি মহিলা, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিদ্যার ছাত্রী। সে ইউনিভার্সিটিতে যাবার পথে মেয়েটিকে রেখে যায়। ফেরার পথে নিয়ে যায়। একদিন ব্যতিক্রম হল, সে মেয়েকে নিতে এল না। রাত পার হয়ে গেল। পরদিন ভোরে তার বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট তালা ঝুলছে। খুব সমস্যায় পড়লাম। মহিলা গেলেন কোথায়? তিন দিন কেটে গেল কোন খোঁজ নেই। আমরা পুলিশে খবর দিলাম। মহিলার মার ঠিকানা বের করে তাঁকে লং ডিসটেন্স টেলিফোন করলাম । ভদ্রমহিলা কঠিন গলায় বললেন, এই সব ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হব। আমার মেয়ের সঙ্গে গত সাত বছর ধরে কোন যোগাযোগ নেই। নতুন করে যোগাযোগ হোক তা আমার কাম্য নয়। জীবনের শেষ সময়টা আমি সমস্যা ছাড়া বাঁচতে চাই।

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তবে জেনি লী নির্বিকার। সে বেশ সহজ ভঙ্গিতে বলল, আমার মা আমাকে তোমাদের ঘাড়ে ডাম্প করে পালিয়ে গেছে। সে আর আসবে না।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, অবশ্যই আসবে।

ঃ না আসবে না। আমি না থাকলেই তার সুবিধা। বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব।

কথাগুলি বলবার সময় মেয়েটির গলা একবারও ধরে এল না। চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করল না। একমাত্র শিশুরাই পারে নির্মোহ হয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে।

জেনি লীর মা চারদিন পর ফিরে আসে। সে তার বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে লং ডিসটেন্স ড্রাইভে দশ হাজার মাইল দূর মন্টানার এক পাহাড়ে চলে গিয়েছিল।

আমেরিকা কী ভাবে বিদেশী ছাত্রদের জীবনে প্রভাব ফেলতে থাকে তার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েই এই গল্প শেষ করব।

শীতের সময়কার ঘটনা।

এখানকার শীত মানে ভয়াবহ ব্যাপার। ঘর থেকে বেরুনো বন্ধ। আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসি। জীবন এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

আমেরিকানদের মতে এই সময়টা স্বামী–স্ত্রীদের জন্যে খুব খারাপ। সবার মধ্যেই তখন থাকে—কেবিন ফিবার। দিনের পর দিন ঘরে বন্দী থেকে মেজাজ হয় রুক্ষ। ঝগড়াঝাটি হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ডির্ভোসের শতকরা ৭৬ ভাগ হয় শীতের সময়টায়।

আমেরিকানদের কেবিন ফিবারের ব্যাপারটা যে কত সত্যি তার প্রমাণ হাতে হাতে পেলাম। অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে কুৎসিত একটা ঝগড়া করলাম গুলতেকিনের সঙ্গে। সে বিস্মিত গলায় বারবার বলতে লাগল, তুমি এ রকম করে কথা বলছ কেন? এসব কী? কেন এরকম করছ?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, ভাল করছি।

ঃ তুমি খুবই বাজে ব্যবহার করছ। কেউ এরকম ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে না।

ঃ কেউ না বলুক, আমি বলি।

ঃ আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।

ঃ চলে যেতে চাইলে যাও। মাই ডোর ইজ ওপেন। দক্ষিণ দোয়ার খোলা।

সে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো তারপর নোভাকে চুমু খেয়ে এক বস্ত্রে বের হয়ে গেল। আমি মোটেই পাত্তা দিলাম না। যাবে কোথায়? তাকে ফিরে আসতেই হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার—সে ফিরে এল না। একদিন এবং একরাত কেটে গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। নোভা ক্রমাগত কাঁদছে, কিছুই খাচ্ছে না। আমি কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছি না। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ করলাম। কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিশে খবর দিলাম।

ফার্গো শহরে অসহায় মহিলাদের রক্ষা সমিতি বলে একটি সমিতি আছে। সেখানেও খোঁজ নিলাম। আমার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়।

দ্বিতীয় দিন পার হল। রাত এল। আমি ঠিক করলাম রাতের মধ্যে যদি কোন খোঁজ না পাই তাহলে দেশে খবর দেব।

রাত আটটায় একটা টেলিফোন এল। একজন মহিলা এ্যাটোর্নি আমাকে জানালেন যে আমার স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদ আমার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েছেন। তিনি ডিভোর্সের মামলা করতে চান।

আমি বললাম, খুবই উত্তম কথা। সে আছে কোথায়?

ঃ সে তার এক বান্ধবীর বাড়িতে আছে। সেই ঠিকানা তোমাকে দেয়া যাবে না। আমি কি মামলার বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব?

ঃ মামলার বিষয়ে কথা বলার কিছুই নেই। আমাদের বিয়ের নিয়ম-কানুন খুব সহজ। এই নিয়মে আমার স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করার অধিকার দেয়া আছে। এই অধিকার বলে সে যে কোন মুহূর্তে আমাকে ত্যাগ করতে পারে। তার জন্যে কোর্টে যাবার প্রয়োজন নেই।

ঃ তোমাদের দেশের নিয়ম-কানুন তোমাদের দেশের জন্যে। আমেরিকায় এই নিয়ম চলবে না।

ঃ তোমার বকবকানি শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। তুমি কি দয়া করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেবে?

ঃ আমি তোমার অনুরোধের কথা তাকে বলতে পারি। যোগাযোগ করবার দায়িত্ব তার।

ঃ বেশ তাই কর।

আমি টেলিফোন নামিয়ে সারা রাত জেগে রইলাম—যদি গুলতেকিন টেলিফোন করে। সে টেলিফোন করল না। বিভীষিকাময় একটা রাত কাটল। ভোরবেলা সে এসে হাজির।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। কিছুই বলছি না। সে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দু'কাপ চা বানিয়ে এক কাপ আমার সামনে রেখে বলল, তোমাকে আমি একটা শিক্ষা দিলাম। যাতে ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আর খারাপ ব্যবহার না কর। যদি কর আমি কিন্তু ফিরে আসব না।

আমি বললাম, আমেরিকা তোমাকে বদলে দিয়েছে।

ঃ হঁ্যা দিয়েছে। এই বদলানোটা কি খারাপ?

ঃ না।

ঃ না-বলার সৎ সাহস যে তোমার হয়েছে সে জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তবে যে বিদ্রোহ এখানে আমি করতে পারলাম দেশে থাকলে তা কখনো করতে পারতাম

না। দিনের পর দিন অপমান সহ্য করে পশু-শ্রেণীর স্বামীর পায়ের কাছে পড়ে থাকতে হত।

ঃ আমি কি পশু-শ্রেণীর কেউ?

ঃ হঁ্যা। নাও চা খাও। তোমার চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন? এই দুদিন কিছুই খাওনি বোধ হয়?

বলতে বলতে পশু-শ্রেণীর একজন মানুষের প্রতি গাঢ় মমতায় তার চোখে জল এসে গেল।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি জানি এর পরেও তুমি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, তবুও আমি বারবার তোমার কাছেই ফিরে আসব। এই দুদিন আমি একবারও আমার মেয়ের কথা ভাবিনি। শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।

আমি মনে মনে বললাম, ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন মিছে এ ভালবাসা।

ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। না জন্মালে ভাব প্রকাশে আমাদের বড় অসুবিধা হত।

ম্যারাথন কিস

চুমু প্রসঙ্গে আরেকটি গল্প বলি। গল্পের নায়ক আমার ছাত্র—বেন ওয়ালি। টিচিং অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে আমি এদের প্রবলেম ক্লাস নেই। সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টা থার্মোডিনামিক্সের অংক করাই এবং ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আণ্ডার-গ্রাজুয়েটে যে সব আমেরিকান পড়তে আসে, তাদের প্রায় সবাই গাধা টাইপের। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে হা করে তাকিয়ে থাকে। প্রবল বেগে মাথা চুলকায়। অংক করতে দিলে শুকনো গলায় বলে, আমার ক্যালকুলেটরে ব্যাটারী ডাউন হয়ে গেছে।

আণ্ডার-গ্রাজুয়েট পড়াশোনা এদের তেমন জরুরী নয়। খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য হাইস্কুলের শিক্ষাই যথেষ্ট। এদের কাছে ইউনিভার্সিটির ফুটবল টিম, বেসবল টিম পড়াশোনার চেয়ে অনেক জরুরী। মেয়েদের লক্ষ্য থাকে ভাল একজন স্বামী জোগাড় করার দিকে। এই কাজটি তাদের নিজেদেরই করতে হয় এবং এর জন্যে যে পরিমাণ কষ্ট এক একজন করে তা দেখলে চোখে পানি এসে যায়।

আমার সঙ্গে রুথ কোয়াণ্ডাল বলে এক আমেরিকান ছাত্রী পি-এইচ-ডি করত। এই মেয়েটি কোন স্বামী জোগাড় করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও যে পারবে এমন সম্ভাবনাও নেই। মেয়েটি মেনাকপর্বতের মত। সে আমাকে দুঃখ করে বলেছিল, আমার যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স ছিল তখন আমি এত মোটা ছিলাম না। চেহারাও ভালই ছিল। তখন থেকে চেষ্টা করছি একজন ভাল ছেলে জোগাড় করতে। পারিনি। কত জনের সঙ্গে যে মিশেছি। ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখার জন্যে কত কিছু করতে হয়েছে। আগেকার অবস্থা তো নেই, এখন ছেলেরা ডেটিং-এর প্রথম রাতেই বিছানায় নিয়ে যেতে চায়। না করি না। না করলে যদি বিরক্ত হয়। আমাকে ছেড়ে অন্য কোন মেয়ের কাছে চলে যায়। এত কিছু করেও ছেলে জুটাতে পারলাম না।

ঃ কেন পারলে না ?

ঃ পারলাম না, কারণ আমি অতিরিক্ত স্মার্ট। সারা জীবন 'A' পেয়ে এসেছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রীদের একজন। ছেলেরা এ রকম স্মার্ট মেয়ে পছন্দ করে না। তারা চায় পুতুপুতু ধরনের ভ্যাদা টাইপের মেয়ে। তুমি বিদেশী, আমাদের

জটিল সমস্যা বুঝতে পারবে না।

আমি আসলেই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় এদের কোথায় যেন কী একটা হয়েছে। সবার মাথার স্ক্রু-র একটা প্যাঁচ কেটে গেছে। উদাহরণ দেই। এটি আমার নিজের চোখে দেখা।

পুরোদমে ক্লাস হচ্ছে। দেখা গেল ক্লাস থেকে দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বের হয়ে গেল। সবার চোখের সামনে এরা সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল। এই ভাবেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটা চক্কর দিয়ে ফেলল। এর নাম হচ্ছে স্ট্রিকিং। এরকম করল কেন? এরকম করল কারণ এরা পৃথিবী জুড়ে যে আণবিক বোমা তৈরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

এদের এইসব পাগলামি সাধারণত ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে আগে দেখা দেয়। আমার ছাত্র বেন ওয়ালির মাথাতে এ রকম পাগলামি ভর করল। স্প্রীং-কোয়ার্টারের শেষে ফাইন্যালের ঠিক আগে আগে আমাকে এসে বলল সে একটা বিশেষ কারণে টার্ম ফাইন্যাল পেপারটা জমা দিতে পারছে না।

আমি বললাম, বিশেষ কারণটা কী?

ঃ চুমুর দীর্ঘতম রেকর্ডটা ভাঙতে চাই। গিনিস বুকে নামটা যেন ওঠে।

আমি বেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বলে কি এই ছেলে?

আমি বললাম, টার্ম ফাইন্যালের পরে চেষ্টা করলে কেমন হয়? তখন নিশ্চিন্ত মনে চালিয়ে যেতে পারবে। টার্ম ফাইন্যাল পেপার জমা না দিলে তো এই কোর্সটায় কোন নম্বর পাবে না।

বেন বিরস মুখে চলে গেল। দু'দিন পর পেপার জমা দিয়ে দিল। আমি ভাবলাম মাথা থেকে ভূত নেমে গেছে। কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ভূত কিন্তু নামল না। আমেরিকানদের ঘাড়ের ভূত খুব সহজে নামে না। ভূতগুলিও আমেরিকানদের মতই পাগলা। কাজেই এক বৃহস্পতিবার রাতে অর্থাৎ উইক-এণ্ড শুরু হবার আগে আগে বেন রেকর্ড ভাঙার জন্য নেমে পড়ল। সঙ্গে স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী—যার পোশাক খুবই উগ্র ধরনের। এই পোশাক না থাকলেই বরং উগ্রতাটা কম মনে হত।

চুমুর ব্যাপারটা হচ্ছে মেমোরিয়াল ইউনিয়নের তিন তলায়। যথারীতি পোস্টার পড়েছে ম্যারাথন চুমু। দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হতে যাচ্ছে ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখলাম ব্যাপারটায় আয়োজনও প্রচুর। দুজন আছে রেকর্ড-কীপার, স্টপ ওয়াচ হাতে সময়ের হিসাব রাখছে। একজন আছেন নোটারী পাবিলক। যিনি

সার্টিফিকেট দেবেন যে, দীর্ঘতম চুম্বনে কোন কারচুপি হয়নি। এই নোটারী পাবলিক সারাক্ষণই থাকবেন কিনা বুঝতে পারলাম না। এদের মত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এরকম একটা ফালতু জিনিস নিয়ে কী করে সময় নষ্ট করে বুঝতে পারলাম না।

বেন এবং মেয়েটিকে নাইলনের দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কেউ সে বেষ্টনীর ভেতর যেতে পারছে না। বাজনা বাজছে। সবই নাচের বাজনা— ওয়াল্টজ। বাজনার তালে তালে এরা দু'জন নাচছে।

আমি মিনিট দশেক এই দৃশ্য দেখে চলে এলাম। এই জাতীয় পাগলামির কোন মানে হয়?

পরদিন ভোরে আবার গেলাম। ম্যারাথন চুমু তখনো চলছে। তবে পাত্র-পাত্রী দুজন এখন সোফায় শুয়ে আছে। ঠোঁটে ঠোঁট লাগানো। বাজনা বাজছে। সেই বাজনার তালে তালে সমবেত দর্শকদের অনেকেই সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নিয়ে খানিকক্ষণ নাচছে। রীতিমত উৎসব।

আমি আমার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে বললাম, ক্ষিধে পেলে ওরা করবে কী? ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে খাওয়া-দাওয়া তো করা যাবে না।

ঃ তরল খাবার খাবে স্ট্র দিয়ে। কিছুক্ষণ আগেই স্যুপ খেয়েছে।

আমি ইতস্তত করে বললাম, বাথরুমে যাবার প্রয়োজন যখন হয় তখন কী করবে?

ঃ জানি না। বাথরুমের জন্যে কিছু সময় বোধ হয় অফ পাওয়া যায়। কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। ওদের জিজ্ঞেস কর।

আমার আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করল না। ততক্ষণে ফ্লোরে উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। এক জোড়া বুড়োবুড়ি উদ্দাম নৃত্যে মেতেছে। ভয়াবহ লাফ-ঝাঁপ। তালে তালে হাত তালি পড়ছে। জমজমাট অবস্থা।

জানতে পারলাম এই বুড়োবুড়ি হচ্ছে বেন ওয়ালির বাবা এবং মা। তারা সুদূর মিনেসোটা থেকে ছুটে এসেছেন ছেলেকে উৎসাহ দেবার জন্যে। ছেলের গর্বে তাঁদের চোখমুখ উজ্জ্বল।

* বেন ওয়ালি দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্ব-রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। তবে সে খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

লাস ভেগাস

দিনটা ছিল বুধবার। জুন মাসের ষোলো বা সতেরো তারিখ। ডানবার হলের এক্সরে রুমে বসে আছি। আমার সামনে গাদা খানিক রিপোর্ট। আমি রিপোর্ট দেখছি এবং ঠাণ্ডা ঘরে বসেও রীতিমত ঘামছি। কারণ গা দিয়ে গাম বের হবার মত একটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। পলিমার ক্লে ইন্টারেকশনের এমন একটা ব্যাপার পাওয়া গেছে যা আগে কখনো লক্ষ্য করা হয়নি। আবিষ্কারটি গুরুত্বপূর্ণ হবার সম্ভাবনা শতকরা ৮০ ভাগ।

আমি দেখিয়েছি যে, পলিমারের মত বিশাল অণু ক্লে-র লেয়ারের ভেতর ঢুকে তার স্ট্রাকচার বদলে দিতে পারে। সব পলিমার পারে না, কিছু কিছু পারে। কোন কোন পলিমার ক্লে লেয়ারের ফাঁক বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কেউ আবার কমিয়ে দেয়। অত্যন্ত অবাক হবার মত ব্যাপার।

সন্ধ্যাবেলা আমি আমার প্রফেসরকে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। ঝিম ভাঙবার পর বললেন, গোল্ড মাইন।

অর্থাৎ তিনি একটি স্বর্ণ-খনির সন্ধান পেয়েছেন। রাত দশটার দিকে তিনি বাসায় টেলিফোন করে বললেন, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির ৫৭তম অধিবেশন হবে নাভাদার লাস ভেগাসে। সেই অধিবেশনে আমরা আমাদের এই আবিষ্কারের কথা বলব।

আমি বললাম, খুবই ভাল কথা। কিন্তু এখনো ব্যাপারটা আমরা ভালমত জানি না। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির মত অধিবেশনে তাড়াহুড়া করে কিছু ...

প্রফেসর আমার কথা শেষ করতে দিলেন না, ঘট করে টেলিফোন রেখে দিলেন।

পরদিন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খুব চেষ্টা করলাম প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে। তিনি সেই সুযোগ দিলেন না। লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত। যতবার কথা বলতে চাই দাঁত-মুখ খিচিয়ে বলেন—দেখছ একটা কাজ করছি, কেন বিরক্ত করছ। আমার কাজ নয়। এটা তোমারই কাজ।

সন্ধ্যাবেলা প্রফেসরের সেই কাজ শেষ হল। তিনি তাঁর সমস্ত ছাত্রদের ডেকে গম্ভীর গলায় বললেন, আমার ছাত্র আহামাদ নাভাদার লাস ভেগাসে তার

আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করবে। সে একটা পেপার দেবে। পেপারের খসড়া আমি তৈরি করে ফেলেছি।

আমার মাথা ঘুরে গেল। ব্যাটা বলে কী? পৃথিবীর সব বড় বড় রসায়নবিদরা জড়ো হবে সেখানে। এইসব জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে আমি কেন? এক অক্ষর ইংরেজী আমার মুখ দিয়ে বের হয় না। যা বের হয় তার অর্থ কেউ বুঝে না। আমি এ-কী বিপদে পড়লাম।

প্রফেসর বললেন, আহামাদ, তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঃ কেন জানতে পারি?

ঃ আমি বক্তৃতা দিতে পারি না।

ঃ এটা খুবই সত্যি কথা।।

ঃ আমি ইংরেজী বললে কেউ তা বুঝতে পারে না।

ঃ কারেক্ট। আমি এত দিন তোমার সঙ্গে আছি, আমি নিজেই বুঝি না। অন্যরা কী বুঝবে।

ঃ আমি খুবই নার্ভাস ধরনের ছেলে। কী বলতে কী বলব।

ঃ দেখ আহামাদ, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে কথা বলতে পারার সৌভাগ্য সবার হয় না। তোমার হচ্ছে।

ঃ এই সৌভাগ্য আমার চাই না।

ঃ বাজে কথা বলবে না। কাজটা তুমি করেছ। আমি চাই সম্মানের বড় অংশ তুমি পাও। কেন ভয় পাচ্ছ। আমি তোমার পাশেই থাকব।

আমি মনে মনে বললাম—ব্যাটা তুই আমাকে এ-কী বিপদে ফেললি।

পনেরো দিনের মধ্যে চিন্তায় চিন্তায় আমার দুপাউণ্ড ওজন কমে গেল। আমার দুশ্চিন্তার মূল কারণ হচ্ছে কাজটা আধাখেচড়াভাবে হয়েছে। কেউ যদি কাজের উপর জটিল কোন প্রশ্ন করে বসে জবাব দিতে পারব না। এ রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় এত বড় বিজ্ঞান অধিবেশনে যাওয়া যায় না। ব্যাটা প্রফেসর তা বুঝবে না।

প্রফেসর তার গাড়িতে করে আমাকে লাস ভেগাসে নিয়ে গেলেন। মরুভূমির ভেতর আলো ঝলমল একটি শহর। জুয়ার তীর্থভূমি। নাইট ক্লাব এবং ক্যাসিনোতে ভরা। দিনের বেলা এই শহর ঝিম মেরে থাকে। সন্ধ্যার পর জেগে ওঠে। সেই জেগে ওঠাটা ভয়াবহ।

আমার প্রফেসরেরও এই প্রথম লাস ভেগাসে আগমন। তিনিও আমার মতই ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছেন। হা হয়ে দেখছেন রাস্তার অপূর্ব সুন্দরীদের ভীড়।

প্রফেসর আমার কানে কানে বললেন, এই একটি জায়গাতেই প্রসটিটিউশন নিষিদ্ধ নয়। যাদের দেখছ, তাদের প্রায় সবাই ঐ জিনিস। দেখবে পৃথিবীর সব সুন্দরী মেয়েরা এসে টাকার লোভে এখানে জড় হয়েছে।

কিছুদূর এগুতেই এক সুন্দরী এগিয়ে এসে বলল, সান্ধ্যকালীন কোন বান্ধবীর কি প্রয়োজন আছে?

আমি কিছু বলবার আগেই প্রফেসর বললেন, না ওর কোন বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি নীল চোখ তুলে শান্ত গলায় বললেন, তোমাকে তো জিগ্‌গেস করিনি। তুমি কথা বলছ কেন?

আমি বললাম, তোমায় ধন্যবাদ, আমার বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি বলল, সুন্দর সন্ধ্যাটা একা একা কাটাবে। এক গ্লাস বিয়ারের বদলে আমি তোমার পাশে বসতে পারি।

আমরা কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। পথে আরো দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা হল। এদের একজন মধুর ভঙ্গিতে বলল, তোমাদের কি ডেট লাগবে? লাগলে লজ্জা করবে না।

আমার প্রফেসর মুখ গম্ভীর করে আমাকে বুঝালেন,—এরা ভয়াবহ ধরনের প্রস্টিটিউট। তোমার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে দেবে না। পত্রপত্রিকায় এদের সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হয়েছে।

প্রফেসরের ভাব এরকম যে গায়ে হাত দিতে দিলে তিনি রাজি হয়ে যেতেন।

রাতের খাবার খেতে আমরা যে রেস্টুরেন্টে গেলাম তা হচ্ছে টপলেস রেস্টুরেন্ট। অর্থাৎ ওয়েট্রেসদের বুকে কোন কাপড় থাকবে না। বইপত্রে এইসব রেস্টুরেন্টের কথা পড়েছি। বাস্তবে এই প্রথম দেখলাম। আমার লজ্জায় প্রায় মাথা কাটা যাবার মত অবস্থা। মেয়েগুলিকে মনে হল আড়ষ্ট ও প্রাণহীন। এদের মুখের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, সবাই তাকাচ্ছে বুকের দিকে। কাজেই তারা খানিকটা প্রাণহীন হবেই। চোখের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। চোখের উপর চোখ রেখে আমরা সেই ভাষায় কথা বলি। এই সব মেয়ে চোখের ভাষা কখনো ব্যবহার করতে পারে না। এরা বড় দুঃখী।

প্রফেসর বিরক্ত মুখে আমাকে বললেন, আমাদের এই টেবিলে বসাটাই ভুল হয়েছে। এই টেবিলের ওয়েট্রেসদের বুকের দিকে তাকিয়ে দেখ। ছেলেদের বুক এরচে অনেক ডেভেলপড্ হয়। এর বুক দেখে মনে হচ্ছে প্রেইরীর সমতল ভূমি।

রাতের খাবারের পর আমরা একটা শো দেখলাম। প্রায় নগ্ন কিছু নারীপুরুষ মিলে গান বাজনা নাচ করল। একটি জাপানি মেয়ে সারা শরীর পালকে ঢেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দর্শকদের কাছে আসছে দর্শকরা একটা করে পালক তুলে নিচ্ছে। তার গা ক্রমশ খালি হয়ে আসছে। সর্বশেষ পালকটি তার গা থেকে খুলে নেবার পর সে স্টেজে চলে গেল এবং চমৎকার একটি নাচ দেখাল। যে মেয়ে এত সুন্দর নাচ জানে তার খালি গা হবার প্রয়োজন পড়ে না।

রাত বারটায় শো শেষ হবার পর আমার প্রফেসর বললেন, লাস ভেগাসে রাত শুরু হয় বারোটার পর। এখন হোটেলে গিয়ে ঘুমুবার কোন মানে হয় না।

আমি বললাম, তুমি কি করতে চাও?

ঃ জুয়া খেলবে নাকি?

ঃ জুয়া কী করে খেলতে হয়, আমি জানি না।

ঃ আমিও জানি না। তবে স্লট মেশিন জিনিসটা বেশ মজার। নিকেল, ডাইম কিংবা কোয়ার্টার (বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা) মেশিনের ফোকরে ফেলে একটা হাতল ধরে টানতে হয়। ভাগ্য ভালো হলে কম্বিনেশন মিলে যায়, ঝুনঝুন শব্দে প্রচুর মুদ্রা বেরিয়ে আসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দুজনের নেশা ধরে গেল। মুদ্রা ফেলি আর স্লট মেশিনের হাতল ধরে টানি। দেখা গেল প্রফেসরের ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। জ্যাক পট পেয়ে গেলেন। এক কোয়ার্টারে প্রায় একশ ডলার। তার সামনে মুদ্রার পাহাড়।

ক্যাসিনো থেকে কিছুক্ষণ পরপর বিনামূল্যে শ্যাম্পেন খাওয়ানো হচ্ছে। ক্যাসিনো যেন বিরাট এক উৎসবের ক্ষেত্র। আমি মুগ্ধ চোখে ঘুরে ঘুরে দেখলাম— ক্যাসিনোর এক একটা টেবিলে কত লক্ষ টাকারই না লেনদেন হচ্ছে। কত টাকাই না মানুষের আছে।

রাত তিনটার দিকে আমরা হোটেলে ফিরলাম। এর মধ্যে আমার প্রফেসর দু'শ ডলার হেরেছেন। আমার কাছে ছিল সত্তর ডলার, তার সবটাই চলে গেছে। আমাকে প্রফেসরের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হবে এবং তা করতে হবে আজ রাতের মধ্যেই। কারণ আমার ধারণা এই লোক আবার ক্যাসিনোতে যাবে এবং তাঁর শেষ কপর্দকও স্লট মেশিনে চলে যাবে।

রাতে এক ফোঁটা ঘুম হল না। সমস্ত দিনের উত্তেজনার সঙ্গে যোগ হয়েছে আগামী দিনের সেশনের দুশ্চিন্তা।

হোটেলের যে ঘরে আমি আছি তা আহামরি কিছু নয়। দুটি বিছানা। একটিতে

আমি অন্যটিতে থাকবে আমাদের ইউনিভার্সিটিরই এক ছাত্র, জিম। সে এখনো ফেরেনি। সম্ভবত কোন ক্যাসিনোতে আটকা পড়ে গেছে। রাতে আর ফিরবে না।

আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরল। চোখের সামনে পুরো দিগম্বর হয়ে সটান পাশের বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমেরিকানদের এই ব্যাপারটা আমাকে সব সময় পীড়া দেয়। একজন পুরুষের সামনে অন্য একজন পুরুষ কাপড় খুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

ডরমিটরী গোসলখানায় এক সঙ্গে অনেকে নগ্ন হয়ে স্নান পর্ব সারে। ব্যবস্থাই এরকম। হয়ত এটাকেই এরা অগ্রসর সভ্যতার একটা ধাপ বলে ভাবছে। এই প্রসঙ্গে ওদের সঙ্গে আমি কোন কথা বলিনি। বলতে ইচ্ছা করেনি।

কেমিক্যাল সোসাইটির মিটিং-এ গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। যা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। উৎসব ভাল। পেপারের চেয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাই প্রধান। আলাপের বিষয় একটাই --- কেমিস্ট্রি।

এই বিষয়ের বড় বড় সব ব্যক্তিত্বকেই দেখলাম। রসায়নে দুই বছর আগে নোবেল পুরস্কার পাওয়া এক বিজ্ঞানীকে দেখলাম লালরঙের একটা গেঞ্জি পরে এসেছেন—সেখানে লেখা 'আমি রসায়নকে ঘৃণা করি।'

অধিবেশনটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক সঙ্গে অনেক অধিবেশন চলছে। যার যেটি পছন্দ সে সেখানে যাচ্ছে।

আমাদের অধিবেশনে পঞ্চাশজনের মতো বিজ্ঞানীকে দেখা গেল। আমার আগে বেলজিয়ামের লিয়েগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী পেপার পড়লেন। তাঁকে এমনভাবে চেপে ধরা হলো যে ভদ্রলোক শুধু কেঁদে ফেলতে বাকি রাখলেন। আমি ঘামতে ঘামতে এই জীবনে যতগুলি সুরা শিখেছিলাম সব মনে মনে পড়ে ফেললাম। আমার মনে হচ্ছিল বক্তৃতার মাঝখানেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এম্বুলেন্স করে আমাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আমার বক্তৃতার ঠিক আগে আগে প্রফেসর উঠে বাইরে চলে গেলেন। এই প্রথম বুঝলাম চোখে সর্ষে ফুল দেখার উপমাটি কত খাঁটি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার কোনরকম বাধা ছাড়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শুরু হল। প্রথম প্রশ্ন শুনে আমার পিলে চমকে গেল। আমি যখন বলতে যাচ্ছি—এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, ঠিক তখনই আমার প্রফেসর উদয় হলেন এবং প্রশ্নের জবাব দিলেন। ঝড়ের মত প্রশ্ন এল, ঝড়ের মতই উত্তর দিলেন প্রফেসর গ্লাস। আমি মনে মনে বললাম, ব্যাটা বাঘের বাচ্চা, পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছে।

সেশন শেষে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আমার বক্তৃতা কেমন হয়েছে?

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, এত চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে এত বাজে বক্তৃতা আমি এই জীবনে শুনিনি।

বলেই হেসে ফেললেন এবং হাসতে হাসতে যোগ করলেন, তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ কাজটাই প্রধান, বক্তৃতা নয়।

ঃ কিভাবে সেলিব্রেট করবো?

ঃ শ্যাম্পেন দিয়ে।

ঃ আর কিভাবে?

এক বোতল শ্যাম্পেন কেনা হল। ব্যাটা পুরোটা গলায় ঢেলে দিয়ে গুনগুন করে গান ধরল—

''Pretty girls are everywhere
If you call me I will be there...''

শীলার জন্ম

আমার দ্বিতীয় মেয়ে শীলার জন্ম আমেরিকায়। জন্ম এবং মৃত্যুর সব গল্পই নাটকীয়, তবে শীলার জন্ম মুহূর্তে যে নাটক হয়, তাতে আমার বড় ভূমিকা আছে বলে গল্পটি বলতে ইচ্ছা করছে।

তারিখটা হচ্ছে ১৫ই জানুয়ারি।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। বরফে বরফে সমস্ত ফার্গো শহর ঢাকা পড়ে গেছে। শেষরাত থেকে নতুন করে তুষারপাত শুরু হল। আবহাওয়া দপ্তর জানাল—

'নিতান্ত প্রয়োজন না হলে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হবে না।' আমার ঘরের হিটিং ঠিকমত কাজ করছিল না। ঘর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। দুতিনটি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছি। এ-রকম দুর্যোগের দিনে ইউনিভার্সিটিতে কী করে যাব তাই ভাবছি। দেশে যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টি-বাদলার দিনে 'রেইনি ডে'-র ছুটি হয়ে যেত, এখানে স্নো ডে বলে তেমন কিছু নেই। চার ফুট বরফে শহর ঢাকা পড়ে গেছে, অথচ তারপরও ইউনিভার্সিটির কাজকর্ম ঠিকমত চলছে।

সকালবেলার ঘুমের মত আরামের ব্যাপার এই জগতে খুব বেশি নেই। সেই আরাম ভোগ করছি, ঠিক তখন গুলতেকিন আমাকে ডেকে তুলে ফ্যাকাশে মুখে বলল, আমার যেন কেমন লাগছে।

আমি বললাম, ঠিক হয়ে যাবে।

বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, এটা মনে হচ্ছে ঐ ব্যাপার।

ঃ ঐ ব্যাপার মানে?

ঃ মনে হচ্ছে ...

মেয়েরা ধাঁধা খুব পছন্দ করে। আমি লক্ষ্য করেছি, যে-কথা সরাসরি বললেও কোন ক্ষতি নেই সেই কথাও তারা ধাঁধার মত বলতে চেষ্টা করে। তার ব্যথা উঠেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এটা বুঝতে আমরা দশ মিনিটের মত লাগল। যখন বুঝলাম তখন স্পাইন্যাল কর্ড দিয়ে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। কী সর্বনাশ!

আমি শুকনো গলায় বললাম, ব্যথা কি খুব বেশি?

ঃ না, বেশি না। কম। তবে ব্যথাটা ঢেউয়ের মত আসে, চলে যায়, আবার আসে। এখন ব্যথা নেই।

ঃ তাহলে তুমি রান্নাঘরে চলে যাও, চা বানাও। চা খেতে খেতে চিন্তা করি প্ল্যান অব অ্যাকশন।

ঃ চিন্তা করার কী আছে? তুমি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে—ব্যস।

ঃ কথা না-বাড়িয়ে চা বানাও। আবার ব্যথা শুরু হলে মুশকিল হবে।

সে রান্নাঘরে চলে গেল। আমি প্ল্যান অব অ্যাকশন ভাবতে বসলাম। গুলতেকিন পুরো ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছে, এটা মোটেই তত সহজ না। প্রধান সমস্যা এই প্রচণ্ড দুর্যোগে তাকে হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছানো। এ ছাড়াও ছোটখাট সমস্যা আছে, যেমন নোভাকে কোথায় রেখে যাব? কে তার দেখাশোনা করবে? হাসপাতালে গুলতেকিনকে কতদিন থাকতে হবে? এই দিনগুলিতে নোভাকে সামলাব কিভাবে?

ঃ নাও, চা খাও। চা খেয়ে দয়া করে কাপড় পর।

ঃ নোভাকে কী করব?

ঃ কিছু করতে হবে না। আমি ফরিদকে টেলিফোন করে দিয়েছি, সে এসে পড়বে।

ঃ ডাক্তারকেও তো খবর দেয়া দরকার।

ঃ খবর দিয়েছি।

ঃ কাজ তো দেখি অনেক এগিয়ে রেখেছ।

ঃ হ্যাঁ, রেখেছি। প্লীজ, চা-টা তাড়াতাড়ি শেষ কর।

চা শেষ করবার আগেই ফরিদ এসে পড়ল। সে কানাডা থেকে এম-এস করে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ-ডি করতে এসেছে। এই ছেলেটি পাকিস্তানী। পাকিস্তানী কারো সঙ্গে নীতিগতভাবেই আমি কোন যোগাযোগ রাখি না। একমাত্র ব্যতিক্রম ফরিদ। পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ জন্মায় যাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে পরের উপকার করা। পরের উপকার করবার সময়টাতেই তারা খানিকটা হাসিখুশি থাকে, অন্য সময় বিমর্ষ হয়ে থাকে। আমি আমার চল্লিশ বছরের জীবনে ফরিদের মত ভাল ছেলে দ্বিতীয়টি দেখিনি, ভবিষ্যতে দেখব সেই আশাও করি না।

নোভাকে ফরিদের কাছে রেখে আমি হাসপাতালের দিকে রওনা হলাম। বরফ-ঢাকা রাস্তায় আমার ভজ্ঞ পোলাবা গাড়ি চলছে। পেছনের সীটে গুলতেকিন কাত হয়ে শুয়ে আছে, মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে কাতরাচ্ছে। আমি বললাম, ব্যথা কি খুব বেড়েছে?

ঃ তুমি গাড়ি চালাও। কথা বলবে না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমার মনে হচ্ছে বেশি দেরি নেই।

ঃ কী সর্বনাশ! আগে বলবে তো।

আমি একসিলেটরে পা পুরোপুরি দাবিয়ে দিলাম। গাড়ি চলল উল্কার গতিতে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই অ্যাকসিডেন্ট না করে সেইন্ট লিউক হাসপাতালে পৌঁছতে পারলাম।

নার্স এসে দেখেশুনে বলল, এক্ষুণি ডেলিভারী হবে, চল ও-টিতে যাই।

গুলতেকিনের চিকিৎসকের নাম ডঃ মেলয়। ডেলিভারী তিনিই করাবেন। আমেরিকান ডাক্তারদের সবার কাছেই ওয়াকি টকি জাতীয় একটি যন্ত্র থাকে। তিনি যেখানেই থাকেন তাঁর সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা যায়। হাসপাতাল থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। তিনি বললেন, এক মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি।

আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যখন সিগারেট ধরিয়েছি তখন হাসপাতালের মেট্রন বলল, তুমি চল আমার সঙ্গে।

ঃ কোথায়?

ঃ অপারেশন থিয়েটারে।

ঃ কেন?

ঃ তুমি তোমার স্ত্রীর পাশে থাকবে। তাকে সাহস দেবে।

ঃ ও খুবই সাহসী মেয়ে। ওকে সাহস দেবার কোন দরকার নেই।

ঃ বাজে কথা বলবে না। তুমি এসো আমার সঙ্গে। ডেলিভারীর সময় আমরা কাউকে ঢুকতে দেই না। শুধু স্বামীকে থাকতে বলি। এর প্রয়োজন আছে।

ঃ আমি তেমন কোন প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না।

ঃ যা ঘটতে যাচ্ছে তার অর্ধেক দায়ভাগ তোমার। তুমি এরকম করছ কেন?

আমি মেট্রনের সঙ্গে রওনা হলাম। ও-টিতে ঢোকার প্রস্তুতি হিসেবে আমাকে মাস্ক পড়িয়ে দিল। অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে দিল। এক ধরনের বিশাল মোজায় পা ঢেকে দেয়া হল। আমি ও-টিতে ঢুকলাম। অপারেশন থিয়েটারটি তেমন আলোকিত নয়। আমার কাছে অন্ধকার অন্ধকার লাগল। ঘরটা ছোট এবং যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। ফিনাইলের যে কটু গন্ধ হাসপাতালে পাওয়া যায় তেমন গন্ধও পেলাম না, তবে নেশা ধরানোর মত মিষ্টি সৌরভ ঘরময় ছড়ানো।

গুলতেকিনকে বিশেষ ধরনের একটা টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার দুপাশে দুজন নার্স। ডাঃ মেলয় এসে পড়েছেন, তিনি ছুরি-কাঁচি গুছিয়ে রাখছেন।

তাদের প্রত্যেকের মুখে মাস্ক থাকার জন্যে তাদের দেখাচ্ছিল ক্লু ক্লাক্স ক্লান-এর সদস্যদের মত। তাদের ঠিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল তারা যেন একদল রোবট। আমি গুলতেকিনের হাত ধরে দাঁড়ালাম।

ডেলিভারী পেইনের কথাই শুধু শুনেছি, এই ব্যথা যে কত তীব্র, কত তীক্ষ্ণ এবং কত ভয়াবহ সেই সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। এই প্রথম ধারণা হল। ঘামে আমার সমস্ত শরীর ভিজে গেল। থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। গলা কাটা কোরবানীর পশুর মত গুলতেকিন ছটফট করছে। এক সময় আমি ডাক্তারকে বললাম, আপনি দয়া করে পেইন কিলার দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিন। ডাক্তার নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, পেইন কিলার দেয়া যাবে না। পেইন কিলার দেয়া মাত্র কন্ট্রাকশনের সমস্যা হবে। আর মাত্র কিছুক্ষণ।

সেই কিছুক্ষণ আমার কাছে অনন্তকাল বলে মনে হল। মনে হল আমি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমার স্ত্রীর হাত ধরে প্রতীক্ষা করছি।

একসময় প্রতীক্ষার অবসান হল, জন্ম হল আমার দ্বিতীয় কন্যা শীলার। হাত পা ছুঁড়ে সে কাঁদছে, সরবে এই পৃথিবীতে তার অধিকার ঘোষণা করছে। যেন সে বলছে, এই পৃথিবী আমার, এই গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য আমার, এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি আমার।

গুলতেকিন ক্লান্ত গলায় বলল, তুমি চুপ করে আছো কেন, আজান দাও। বাচ্চার কানে আল্লাহর নাম শোনাতে হয়।

আমি আমার ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম, আল্লাহু আকবর...

নার্সের হাতে একটা ট্রে ছিল। ভয় পেয়ে সে ট্রে ফেলে দিল। ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, What is happening?

তাদের কোন কথাই আমার কানে ঢুকছে না। আমি অবাক হয়ে দেখছি আমার শিশু কন্যাকে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। পৃথিবীর রূপরসগন্ধ হয়তো-বা ইতিমধ্যেই তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। আমি প্রার্থনা করলাম, যেন পৃথিবী তার মঙ্গলময় হাত প্রসারিত করে আমার কন্যার দিকে। দুঃখ-বেদনার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রগাঢ় আনন্দ বারবার আন্দোলিত করে আমার মা-মণিকে।

পাখি

উইন্টার কোয়ার্টার শুরু হয়েছে। শীত এখনো তেমন পড়েনি। ওয়েদার ফোরকাস্ট হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যে প্রথম তুষারপাত হবে। এ বছর অন্য সব বছরের চেয়ে প্রচণ্ড শীত পড়বে,—এরকম কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। প্রাচীন মানুষেরা আকাশের রঙ দেখে শীতের খবর বলতে পারতেন। স্যাটেলাইটের যুগেও তাদের কথা কেমন করে জানি মিলে যায়।

ভোরবেলা ক্লাসে রওনা হয়েছি। ঘর থেকে বের হয়ে মনে হল আজ ঠাণ্ডাটা অনেক বেশি। বাতাসের প্রথম ঝাপটায় মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি ফিরে এসে পার্কা গায়ে দিয়ে রওনা হলাম। পার্কা হচ্ছে এমন এক শীতবস্ত্র যা পরে শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রী নিচেও দিব্যি ঘোরাফেরা করা যায়।

হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি পায়ের সামনে চড়ুই পাখির মতো কালো রঙয়ের একটা পাখি 'চিক্‌ চিক্‌' ধরনের শব্দ করছে। মনে হল শীতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমি পাখিটিকে হাতে উঠিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার আঙুলে ঠোঁট ঘষতে লাগলো। আমার মনে হলো পাখিদের কায়দায় সে বলল—তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তাকে নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। উদ্দেশ্য, আমার কন্যাকে পাখিটা দেব। সে জীবন্ত খেলনা পেয়ে উল্লসিত হবে। শিশুদের উল্লাস দেখতে বড় ভালো লাগে।

আমার কন্যা পাখি দেখে মোটেই উল্লসিত হলো না। ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগলো। মুগ্ধ হল মেয়ের মা। সে বারবার বলতে লাগল—ও মা কী সুন্দর পাখি! ঠোঁটগুলো দেখ, মনে হচ্ছে চব্বিশ ক্যারেট গোল্ডের তৈরি। সে পাখিকে পানি খেতে দিল, ময়দা গুলে দিল। পাখি কিছুই স্পর্শ করল না। একটু পরপর বলতে লাগল 'চিক্‌ চিক্‌'। ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছিল, আমি ক্লাসে চলে গেলাম। পাখির কথা আর মনে রইল না।

বিকেল তিনটার দিকে আমার কাছে একটা টেলিফোন এল। এক আমেরিকান তরুণী খুবই পলিশ্‌ড গলায় বলল, মিঃ আমেদ, তুমি কি কোন পাখি কুড়িয়ে পেয়েছ?

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এই খবর জানলে কোত্থেকে?

আমার বস আমাকে বললেন, আমি ফারগো পশু-পাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির অফিস থেকে বলছি।

আমি আতংকিত গলায় বললাম, পাখিকে বাসায় নিয়ে যাওয়া কি বেআইনি?

ঃ না, বেআইনি নয়। আমরা তোমার পাখিকে পরীক্ষা করতে চাই। মনে হচ্ছে ওর ডানা ভেঙে গেছে।

ঃ আমি কি পাখিকে নিয়ে আসবো?

ঃ তোমাকে আসতে হবে না, আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। তোমার অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বার বল।

আমি নাম্বার বললাম। এবং মনে মনে ভাবলাম, এ-কী যন্ত্রণায় পড়া গেল।

বাসায় এসে দেখি পাখিটির জন্য আমার স্ত্রী কার্ডবোর্ডের একটা বাসা বানিয়েছে। নানান খাদ্যদ্রব্য তাকে দেওয়া হচ্ছে। সে কিছু কিছু খাচ্ছেও। তবে আমার কন্যার ভয় ভাঙেনি। সে মার কোল থেকে নামছে না। পাখির কাছে নিয়ে গেলেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।

আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম পাশের অ্যাপার্টমেন্টের এক মহিলা এসেছিলেন বেড়াতে, পাখি দেখে তিনিই টেলিফোন করেন।

পশু-পাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির লোক এসে সন্ধ্যার আগে পাখি নিয়ে গেল। রাত আটটায় টেলিফোন করে জানাল যে পাখিটার ডানা ভাঙা। এক্সরেতে ধরা পড়েছে। তাকে পশু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ডানা জোড়া লাগানো যায়। যদিও এসব ক্ষেত্রে চেষ্টা সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হল। মুখে বললাম, আমি খুবই আনন্দিত যে পাখিটার একটা গতি হচ্ছে। পাখি নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

সাতদিন কেটে গেল। পাখির কথা প্রায় ভুলতে বসেছি, তখন টেলিফোন এল হাসপাতাল থেকে। ডাক্তার সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, ডানা জোড়া লেগেছে।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

ঃ পাখিটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঃ তার কোন প্রয়োজন দেখছি না। আমার মেয়ে এই পাখি ঠিক পছন্দ করছে না। সে উলের কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে পাখিটাকে মেরে ফেলতে পারে বলে আমার ধারণা।

ঃ তাহলে তো বিরাট সমস্যা হল।

ঃ কী সমস্যা?

ঃ দেখ, এটা হচ্ছে মাইগ্রেটরী বার্ড। শীতের সময়ে গরমের দেশে উড়ে চলে যায়। সমস্যাটা হল ফারগোতে শীত পড়ে গেছে। এই গোত্রের পাখি সব উড়ে চলে গেছে। একমাত্র তোমার পাখিটিই যেতে পারেনি।

ঃ এখন করণীয় কী?

ঃ ছ'মাস পাখিটাকে পালতে হবে। গোটা শীতকালটা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ঃ আমি তোমাকে আগেই বলেছি আমার পক্ষে সম্ভব না।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, কোন কুক্ষণে না জানি এই পাখি ঘরে এনেছিলাম।

একদিন পর আবার পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির বড়-কর্তার টেলিফোন, আমেদ, তুমি নাকি তোমার পাখি নিতে রাজি হচ্ছ না?

ঃ এটা আমার পাখি না। বনের পাখি। খানিকক্ষণের জন্যে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

ঃ পাখিটির এই দুঃসময়ে তুমি তার পাশে দাঁড়াবে না? এই মাইগ্রেটরী পাখি যাবে কোথায়?

ঃ আমি খাঁটি বাংলা ভাষায় বললাম, জাহান্নামে যাক।

ঃ তুমি কী বললে?

ঃ বললাম যে তোমরা একটা ব্যবস্থা কর। আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার মেয়ে পাখি পছন্দ করে না। আমি বরং এই ছ'মাস পাখিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে যা খরচ হয় তা দিতে রাজি আছি।

ভদ্রলোক বললেন, দেখি কী করা যায়। বাকি দিনগুলি আতংকের মধ্যে কাটতে লাগলো। টেলিফোন বাজলেই চমকে উঠি, ভাবি এই বুঝি পশুপাখিওয়ালারা নতুন ঝামেলা করছে।

দিন দশেক পার হল। আমি হাঁফ ছেড়ে ভাবলাম, যাক আপদ চুকেছে। তখন আবার টেলিফোন। সেই পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতি। তবে এবার তাদের গলায় আনন্দ ঝরে পড়ছে।

ঃ আমেদ, সুসংবাদ আছে।

ঃ কী সুসংবাদ?

ঃ তোমার পাখির একটা গতি করা গেছে।

ঃ তাই নাকি? বাহ্, কী চমৎকার!

ঃ আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সিয়াটল ওয়াশিংটনে এই পাখি এখনো আছে। সিয়াটলে শীত এখনো তেমন পড়েনি। কাজেই পাখিরা মাইগ্রেট করেনি।

ঃ বল কী?

ঃ আমরা তোমার পাখিটি সিয়াটল পাঠিয়ে দিচ্ছি। সিয়াটলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে, সে অন্য পাখিদের সঙ্গে মিশে মাইগ্রেট করবে।

ঃ অসাধারণ।

ঃ আগামী মঙ্গলবার পাখিটি সিয়াটল যাচ্ছে। তুমি বেলা তিনটায় গ্রেহাউণ্ড বাস স্টেশনে চলে আসবে। শেষবারের মত তোমার পাখিটাকে হ্যালো বলবে।

ঃ অবশ্যই বলব।

সিয়াটল ফার্গো থেকে তিন হাজার মাইল দূরে। পাখিটাকে খাঁচায় করে গ্রে হাউণ্ড বাসের ড্রাইভারের হাতে তুলে দেয়া হল। আমি হাত নেড়ে পাখিটাকে বাই জানালাম।

মনে মনে বললাম, এই আমেরিকানরাই মাই-লাই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বোমা ফেলে হিরোশিমা নাগাশিকিতে। কী করে তা সম্ভব হয় কে জানে!

ক্যাম্পে

আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল আমেরিকানরা জাতি হিসাবে আধাপাগল। এদের রক্তে পাগলামি মিশে আছে। এমন সব কাণ্ডকারখানা করে যা বিদেশী হিসেবে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার থাকে না। যেমন ওদের ক্যাম্পিং-এর ব্যাপারটা ধরা যাক। আগে ক্যাম্পিং বিষয়ে কিছুই জানতাম না। কেউ আমাকে কিছু বলেও নি। নিজেই লক্ষ্য করলাম, সামারের ছুটিতে দলবল নিয়ে এরা কোথায় যায়। ফিরে আসে কাকতাড়ুয়া হয়ে, গায়ের চামড়া খসখসে, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চুল উস্কুখুস্কু। ওজনও অনেক কমে গেছে। সেই কারণেই হয়ত সবাইকে খানিকটা লম্বা দেখায়। কোথায় গিয়েছিলে জিজ্ঞেস করলে বলে,—ক্যাম্পে।

ঃ সেটা কি?

ঃ ক্যাম্পিং কি তুমি জান না?

ঃ না।

আমার 'না' শুনে তারা এমন একটি ভঙ্গি করে—যেন আমার মত জংলি এ দেশে কেন এল তা তারা বুঝতে পারছে না।

খোঁজ নিয়ে জানলাম প্রতিটি আমেরিকান পরিবার বছরে খানিকটা জংগলে কাটায়। তাঁবুটাবু নিয়ে কোন-এক বিজন বনে চলে যায়। একে তারা বলে প্রকৃতির কাছাকাছি চলে যাওয়া।

ল্যাবরেটরীতে আমার সঙ্গে কাজ করে কোয়াগুল। সে তার ছেলে বন্ধুকে নিয়ে ক্যাম্পিং-এ গেল। ফিরে এল হাতে এবং পায়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। গিজলি বিয়ার (প্রকাণ্ড ভালুক) নাকি তাদের তাঁবু আক্রমণ করেছিল। ভয়াবহ ব্যাপার! অথচ রুথ কোয়াগুল এমন ভাব করছে যেন জীবনে এরকম ফান হয়নি। আমি মনে মনে বললাম, বদ্ধ উন্মাদ।

উন্মাদ রোগ সম্ভবত ছোঁয়াচে, কারণ পরের বছর আমি নিজেও ক্যাম্পিং-এ যাব বলে ঠিক করে ফেললাম। দেখাই যাক ব্যাপারটা কি। আমার দ্বিতীয় মেয়েটির বয়স তখন তিন মাস। ফার্গো শহরে যে কটি বাঙালী পরিবার সে সময় ছিল সবাই আমাকে আটকাবার চেষ্টা করল। তাদের যুক্তি—এত বাচ্চা একটা মেয়ে নিয়ে এরকম পাগলামির কোন মানে হয় না। মানুষের উপদেশ আমি খুব মন দিয়ে শুনি,

তবে উপদেশ মত কখনো কিছু করি না। কাজেই চল্লিশ ডলার দিয়ে ইউনিভারসিটি থেকে একটা তাঁবু ভাড়া করলাম, একটা এলুমিনিয়ামের নৌকা ভাড়া করলাম, আর ভাড়া করলাম ক্যাম্পিং-এর জিনিসপত্র। সেই সব জিনিসপত্রের মধ্যে আছে কুড়াল, ফার্স্ট এড বক্স, সাপে কাটার অষুধ এবং কী আশ্চর্য একটা হ্যারিকেন। খোদ আমেরিকাতেও যে কেরোসিনের হ্যারিকেন পাওয়া যায় কে জানত।

যথাসময়ে গাড়ির ছাদে নৌকা বেঁধে রওয়ানা হয়ে গেলাম। গায়ে ক্যাম্পিং-এর পোশাক—হাফ প্যান্ট এবং বস্তার মত মোটা কাপড়ের ফ্ল্যাপ দেয়া শার্ট, মাথায় ক্রিকেট আম্পায়ারদের টুপির মত ধবধবে সাদা টুপি। গাড়ি চলছে ঝড়ের গতিতে। বনে যাবার এই হচ্ছে নিয়ম। স্পীডিং-এর জন্য পুলিশ অবশ্যই গাড়ি থামাবে, তবে যখন বুঝবে এই দল ক্যাম্পিং-এ যাচ্ছে তখন কিছু বলবে না। ক্যাম্পিং-এর প্রতি সবারই কিছুটা দুর্বলতা আছে।

ফার্গো শহর থেকে দুশ দশ কিলোমিটার দূরে একটা ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে গাড়ি থামালাম। সমস্ত আমেরিকা জুড়ে অসংখ্য ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড আছে। ব্যক্তি-মালিকানায় এইসব পরিচালিত হয়। টাকার বিনিময়ে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে ঢোকা যায়। সেখানে ছোটখাটো একটা অফিস থাকে। বিজন জংলি জায়গা হলেও অফিসটা খুব আধুনিক হয়। টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকে, ছোটখাটো বার থাকে, গ্রোসারী শপ এবং বেশ কিছু ভেণ্ডিং মেশিন থাকে। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী মিলে অফিস এবং দোকানপাট দেখাশোনা করেন।

আমার গাড়ি ঢোকা মাত্রই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের ওয়ার্ডেন বিশালদেহী এক আমেরিকান বের হয়ে এল এবং অনেকটা মুখস্থ বক্তৃতার মত বলল, তুমি চমৎকার একটি জায়গায় এসেছ। এর চেয়ে ভাল ক্যাম্পিং গাউণ্ড নর্থ আমেরিকায় আর নেই। আমরা তুলনামূলকভাবে টাকা বেশি নিই, তবে এক রাত কাটালেই বুঝতে পারবে কেন নিই। এমন অপূর্ব দৃশ্য তুমি কোথায়ও পাবে না। তোমার সামনে সল্ট হ্রদের নীল জলরাশি, পেছনে গভীর বন। এ ছাড়াও তুমি পাচ্ছ আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ, যেমন খবরের কাগজ এবং ফ্ল্যাস টয়লেট. . .

ভদ্রলোকের বক্তৃতার মাঝখানেই আমি বললাম, কত দিতে হবে?

দেখা গেল টাকার পরিমাণ আসলেই অনেক বেশি। হ্রদে নৌকা ভাসানোর জন্য ফী দিতে হল, মাছ কেনার জন্য পারমিট কিনতে হল . . . নানান ফ্যাকড়া।

ঝামেলা মিটিয়ে রওয়ানা হলাম জায়গা বাছতে। কোথায় তাঁবু ফেলব সেই জায়গা। ওয়ার্ডেনের স্ত্রী (উনার সাইজও কিংকং-এর মত) আমাকে সাহায্য

করতে নিজেই এগিয়ে এলেন। হ্রদের পাশে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল। কাঁচের মত স্বচ্ছ জল। দশ ফুট নিচের পাথরের খণ্ডটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্রদ যত না সুন্দর পেছনের অরণ্য তার চেয়েও সুন্দর। যে কোন সুন্দর জিনিসের সঙ্গে খানিকটা বিষণ্ণতা মেশানো থাকে। আমার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। গুলতেকিন বলছে— এত সুন্দর! এত সুন্দর!

হ্রদের কাছাকাছি তাঁবু খাটাবার জায়গা ঠিক করে কিংকং ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানালাম। ভদ্রমহিলা যাবার আগে বলে গেলেন, ক্যাম্পিং-এর যাবতীয় জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে তাঁদের কাছে ভাড়া পাওয়া যাবে। তবে তারা চেক গ্রহণ করেন না। পেমেন্ট হবে ক্যাশে।

সকাল এগারটার মত বাজে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে, বাতাসে ঘাসের বিচিত্র গন্ধ, চারদিকে নিঝঝুম। ফ্লাক্স ভর্তি করে চা এনেছিলাম। চা শেষ করে প্রবল উৎসাহে তাঁবু খাটাতে লেগে গেলাম। তাঁবুর সঙ্গে একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়েল আছে—কোন খুঁটি কিভাবে পুঁততে হয়, তাঁবুর কোন আংটা কোন খুঁটিতে যাবে সব পরিষ্কার করে লেখা। কাজটা খুবই সহজ মনে হল। ঘণ্টা খানেক পার হবার পর বুঝলাম কাগজপত্রের কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছিল আসলে তত সহজ নয়। তাঁবুর একটা দিক যখন কোন মতে দাঁড়ায় তখন অন্য দিক ঝুলে পড়ে। সেইটা ঠিক করতে যখন যাই তখন গোটা তাঁবু মাটিতে শুয়ে পড়ে। আমার স্ত্রী এই দু ঘণ্টায় পঞ্চাশবারের মত ঘোষণা করল যে, আমার মত অকর্মণ্য মানুষ সে আর দেখেনি। সে হলে দশ মিনিটের মাথায় নাকি তাঁবু ঠিক করে ফেলত। আমি তাকে তার প্রতিভা প্রমাণ করার সুযোগ দিলাম। এবং আরো এক ঘণ্টা নষ্ট হল। দেখা গেল তাঁবু খাটানোয় তার প্রতিভা আমার মতই।

আমাদের তাঁবু কেমন খাটানো হয়েছে দেখার জন্য ওয়ার্ডেনের স্ত্রী বিকেলের দিকে এলেন এবং বললেন, সামান্য ফিসের বিনিময়ে তাঁবু খাটানোর কাজটা তাঁরা করে দেন।

ফী দেওয়া হল এবং চমৎকার তাঁবু তারা খাটিয়ে দিল। দুপুরে আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। বন থেকে কুড়াল দিয়ে কাঠ কেটে এনে আগুনে মাংস ঝলসে খাওয়াই হচ্ছে নিয়ম।

কাঠ যোগাড় হল, কিন্তু কিছুতেই আগুন ধরানো গেল না। কেরোসিন ঢেলে দিলে আগুন জ্বলে ওঠে, খানিকক্ষণ জ্বলে তারপর আর নেই। আমি ওয়ার্ডেনের

স্ত্রীকে (মিসেস সিমসন) গিয়ে বললাম, আপনি কি সামান্য ফীসের বিনিময়ে আমাদের চুলাটা ধরিয়ে দিবেন?

ভদ্রমহিলা আমার রসিকতায় খুবই বিরক্ত হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, কেরোসিন কুকার পাওয়া যায়। তার একটি নিতে পার।

দশ ডলার দিয়ে কেরোসিন কুকার ভাড়া করলাম। দুপুরে লাঞ্চ শেষ হল সন্ধ্যার আগে আগে। আমাদের মত প্রচুর ক্যাম্পযাত্রী এখানে এসেছে, তবে তারা সবাই চলে গেছে বনের দিকে। জলের দেশের মানুষ বলেই আমরাই একমাত্র জলের কাছাকাছি আছি। বনের চেয়ে জল আমাকে বেশি আকর্ষণ করে।

সন্ধ্যায় নৌকায় খানিকক্ষণ বেড়ালাম। আমেরিকান নিয়ম অনুযায়ী সবার জন্য লাইফ জ্যাকেট ভাড়া করতে হল—আরো কিছু টাকা পেলেন মিসেস সিমসন। নৌকায় থাকতে থাকতে চাঁদ উঠে গেল। বিশাল চাঁদ। পঞ্জিকা দেখে রওয়ানা হই নি। পাকে চক্রে পূর্ণিমার মধ্যে পড়ে গেছি। হ্রদের নিস্তরঙ্গ জলে চাঁদের ছায়া, দূরে বনরাজি, পাখপাখলির ডাক, অদ্ভুত পরিবেশ। আমি চিরকাল শহরবাসী, কাজেই পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। বারবার মনে হচ্ছে স্বর্গের যে সব বর্ণনা ধর্মগ্রন্থগুলিতে আছে সেই স্বর্গ কি এর চেয়েও সুন্দর?

তাঁবুতে ফিরলাম সন্ধ্যা মিলাবার অনেক পরে। গুলতেকিন রাতের খাবার রাঁধতে বসল। আমি বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বের হলাম। সে বলল, এই বনে কি বাঘ আছে?

আমি বললাম, আছে।

সে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, বাঘ আমাদের কখন খেয়ে ফেলবে বাবা?

জগতের সত্যগুলি শিশুরা খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। কখনই তেমন বিচলিত হয় না। শিশুদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে।

দূর্বাঘাসের চাদরে আদিগন্ত ঢাকা। বড় গাছগুলির অধিকাংশের নাম আমি জানি না। উইলী, ওক এবং ইউক্লিপটাস চিনতে পারছি। চাঁদের আলোয় চেনা গাছগুলিকেও অচেনা লাগছে।

এক সময় আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার জন্য আমার প্রাচ্যদেশীয় চোখ প্রস্তুত ছিল না। এক দল তরুণ-তরুণী বনের ভেতর ছোটাছুটি করছে। তাদের গায়ে কাপড়ের কোন বালাই নেই।

আমি শুনেছি আমেরিকানরা গভীর বনে প্রবেশ করার পর সভ্যতার শিকল—কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে। ফিরে যায় আদম এবং হাওয়ার যুগে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা যার নাম। এই দৃশ্য নিজের চোখে কখনও দেখব তা ভাবিনি।

দৃশ্যটি আমার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক বা অশ্লীল মনে হল না। বরং মনে হল এটাই স্বাভাবিক, এটাই হওয়া উচিত।

আমার মেয়ে বলল, বাবা ওদের কি খুব গরম লাগছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চল আমরা ফিরে যাই।

আমি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম। কত রাত তা জানা হল না, ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করল না। মেয়ে দুটি তাঁবুতে ঘুমাচ্ছে। আমি এবং গুলতেকিন তাঁবুর বাইরে বসে আছি। স্বামী-স্ত্রীরা প্রেমিক-প্রেমিকার মত ভালবাসাবাসির কথা কখনো বলে না। সেই রাতে আমরা বিশ্বের আগের সময়ে কেমন করে যেন ফিরে গেলাম। পাশে বসা তরুণীটিকে অচেনা মনে হতে লাগল। বারবার মনে হচ্ছিল — এত আনন্দ আছে পৃথিবীতে।

ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখা আমার কখনো হয়ে ওঠে না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার অনেক রাতে ঘুমুতে যাবার পরেও জেগে উঠলাম সূর্য ওঠার আগে।

সূর্যোদয়ের দৃশ্যটি এত সুন্দর কখনো ভাবিনি। আগে জানতাম না, সূর্যটাকে ডিমের কুসুমের মত দেখায়, জানতাম না ভোরবেলায় সূর্য এত বড় থাকে। এই সূর্য আকাশে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, তাও জানা ছিল না।

সকালে নাশতা হল দুধ এবং শিরিয়েলের। নাশতার পর দলবদল নিয়ে মাছ ধরতে বের হলাম। আমেরিকায় বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে চাইলে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লাইসেন্স করতে হয়। লাইসেন্সের ফী পনের ডলার। লাইসেন্স করা ছিল, তারপরও বুড়ি সিমসনকে পাঁচ ডলার দিতে হল। এটা নাকি লেক রক্ষণাবেক্ষণের ফী। বড়শি ফেলে মূর্তির মত বসে থাকার কাজটি খুব আনন্দদায়ক হবে মনে করার কোন কারণ নেই—তবু যেহেতু লাইসেন্স করেছি কাজেই বসে রইলাম। শুনেছিলাম আমেরিকান লেকভর্তি মাছ, টোপ ফেলতে হয় না, সুতা ফেললেই হয়, সুতা কামড়ে মাছ উঠে আসে। বাস্তবে সে রকম কিছু ঘটলো না। আমি পুরো পরিবার নিয়ে মাছ ধরার আশায় ঝাঁ-ঝাঁ রোদে তিন ঘন্টা কাটিয়ে দিলাম। মাছের দেখা নেই। এক সময় বুড়ি সিমসন এসে উদয় হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, লেকের কোন জায়গায় মাছ টোপ খায় এবং কখন কিভাবে বড়শি

ফেলতে হয় সেই বিষয়ে তাদের একটি বুকলেট আছে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়? কিনলাম বুকলেট এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ। বিশাল এক নরদারর্ণ পাইক ধরে ফেললাম। এই আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ মৎস্য শিকার। আমার বড় মেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, বাবা এটা কি তিমি মাছ? বাবা, আমরা কি একটা তিমি মাছ ধরে ফেলেছি?

দুপুরে লাঞ্চ হল সেই মাছ। ওয়েস্টার্ন ছবির কায়দায় আগুনে ঝলসিয়ে লবণ ছিটিয়ে খাওয়া। অন্য সময় এই মাছ আমি মুখেও দিতে পারতাম না। কিন্তু পরিবেশের কারণে সেই আগুনে ঝলসানো অখাদ্যকেও মনে হল স্বর্গের কোন খাবার।

লাঞ্চ শেষ হবার আগেই একটা দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। জানা গেল ন'বছর বয়সী একটা ছেলে দলছুট হয়ে বনে হারিয়ে গেছে। ছেলেটির বাবা-মা ভাইবোন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। বনে হারিয়ে যাবার ঘটনা নতুন কিছু না।

টিভি এবং খবরের কাগজে প্রায়ই এরকম খবর আসে। গত বছর উনিশ বছর বয়সী একটা মেয়ে মন্টানার এক বনে হারিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করা হয় তের দিন পরে। সে এই তের দিন ব্যাঙ, সাপ-খোপ লতাপাতা খেয়ে বেঁচে ছিল। কেউ কেউ ইচ্ছে করেই বনে থেকে যায়। তেত্রিশ দিন পর হারিয়ে যাওয়া এক দম্পতিকে খুঁজে বের করার পর তারা বলেন—নাগরিক সভ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা বনে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা ভালই আছেন। শহরে ফিরতে চান না।

ন বছর বয়সী শিশুটির নিশ্চয়ই এরকম কোন সমস্যা নেই। সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে। ক্যাম্পে সাজসাজ রব পড়ে গেল। স্টেট পুলিশকে খবর দেওয়া হল। ঘন্টা খানিকের মধ্যে দুটি হেলিকপ্টার বনের উপর দিয়ে চক্রাকারে উড়তে লাগল। হেলিকপ্টার থেকে জানানো হল বাচ্চাটিকে দেখা যাচ্ছে। একটা ফাঁকা জায়গায় আছে, নিজের মনে খেলছে। ভয়ের কিছু নেই।

বাচ্চাটিকে যখন উদ্ধার করা হল, সে গম্ভীর গলায় বলল, আমি হারাব কেন? আমার পকেটে তো কম্পাস আছে।

দু'দিন থাকবার পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলাম, এক সপ্তাহ থেকে গেলাম। মিসেস সিমসন একদিন এসে বললেন, তোমরা আর থেকো না। বেশিদিন থাকলে

নেশা ধরে যাবে। আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না। এই আমাদেরকে দেখ, বছরের পর বছর এই জায়গায় পড়ে আছি। ঘণ্টা খানিকের জন্যও শহরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মিসেস সিমসন বললেন, সতেরো বছর আগে আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে ক্যাম্পিং-এ এই জায়গায় এসেছিলাম। এতই ভাল লাগল যে, লীজ নিয়ে ক্যাম্পিং স্পট বানালাম। তারপর থেকে এখানেই আছি। বছরে তিনটা মাস লোকজনের দেখা পাই, তারপর দুজনে একা একা কাটাই।

ঃ কষ্ট হয় না?

ঃ না। বনের অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে। তোমরা যারা দু'একদিনের জন্য আস, তারা তা ধরতে পার না। আমরা পারি। পারি বলেই . . .

মিসেস সিমসন তাঁর কথা শেষ করলেন না। আমি বললাম, রহস্যময় ব্যাপারগুলি কি?

ঃ ঐ সব তোমরা বিশ্বাস করবে না। ঐ প্রসঙ্গ বাদ থাক।

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বনের দিকে তাকালেন। রহস্যময় বন হয়ত কানে কানে তাঁকে কিছু বলল। দেখলাম তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মিসেস সিমসন বললেন, একটা মজার ব্যাপার কি জান? সমুদ্র মানুষকে আকর্ষণ করে। এত যে সুন্দর সমুদ্র তার পাশেও তিন চার দিনের বেশি মানুষ থাকতে পারে না। আর বন মানুষকে আকর্ষণ করে। মানুষকে সে চলে যেতে দেয় না। পুরোপুরি গ্রাস করতে চেষ্টা করে। কাজেই তোমরা চলে যাও।

আমরা চলে গেলাম।

সব মিলিয়ে সাত দিন ছিলাম। মিসেস সিমসন তিন দিনের ভাড়া রাখলেন। শান্ত গলায় বললেন, তোমরা তিন দিন থাকতে এসেছিলে সেই তিন দিনের রেন্ট-ই আমি রেখেছি। বাকি দিনগুলি কাটিয়েছ অতিথি হিসাবে। বনের অতিথি। বন তোমাদের আটকে রেখেছে। কাজেই সেই চার দিনের ভাড়া রাখার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

নামে কিবা আসে যায়

'সামার হলিডে' শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সবার মনই এই সময় খানিকটা তরল অবস্থায় থাকে। অত্যন্ত কঠিন অধ্যাপককেও এই সময় নরম এবং আদুরে গলায় কথা বলতে দেখা যায়।

আমার অধ্যাপকের নাম জোসেফ এডওয়ার্ড গ্লাস। গ্লাস নামের সার্থকতা বুঝানোর জন্যই হয়তো ভদ্রলোক কাঁচের মত কঠিন এবং ধারালো। সামার হলিডের তারল্য তাঁকে স্পর্শ করেনি। ভোর ন'টায় ল্যাবে এসে দেখি সে একটা বিকারের কপার সালফেটের সল্যুসন বানিয়ে খুব ঝাঁকাচ্ছে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, ভোরবেলা গ্লাসের সঙ্গে দেখা হলে সারাটা দিন খারাপ যাবে।

গ্লাসকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রবাদের কারণে নয়। মন খারাপ হলো কারণ ব্যাটার আজ থেকে ছুটিতে যাবার কথা। যায়নি যখন তখন বুঝতে হবে সে এই সামারে ছুটিতে যাবে না। ছুটির তিন মাস আমাকে জ্বালাবে। কারণ জ্বালানোর জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ল্যাবে নেই। সবাই ছুটি নিয়ে কেটে পড়েছে।

আমি প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ গলায় বললাম,—হাই।

গ্লাস আনন্দে সব ক'টা দাঁত বের করে বলল, তুমি আছো তাহলে। থ্যাংকস। এসো দু'জনে মিলে এই সল্যুশানটার ডিফারেনসিয়েল রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স বের করে ফেলি।

আমি বললাম, এটা সম্ভব না। আমি আমার নিজের কাজ করবো। এর মধ্যে তুমি আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হবো।

বাংলাদেশের পাঠক–পাঠিকারা আমার জবাব শুনে হয়তো আঁতকে উঠেছেন। আমার পি–এইচ–ডি গাইড এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায় ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান একজন অধ্যাপকের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে না, তবে আমেরিকান চরিত্র সম্পর্কে যাদের কিছুটা ধারণা আছে, তারাই বুঝবেন আমার জবাব হচ্ছে যথাযথ জবাব।

প্রফেসর গ্লাস খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে বলল, হামাদ, এটা সামান্য কাজ। এক ঘণ্টাও লাগবে না।

আমি বললাম, আমাকে হামাদ ডাকছ কেন? আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ। হামাদটা তুমি পেলে কোথায়?

'নাম নিয়ে তুমি এত যন্ত্রণা করো কেন হামাদ? নামে কিবা যায় আসে? আমি একজন ওল্ডম্যান। তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি কাজটা করে দিতে। আর তুমি নাম নিয়ে যন্ত্রণা শুরু করে দিলে।'

আমি ডিফারেনসিয়েল রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স বের করে দিলাম। ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা লাগলো। কোনো কিছুই হাতের কাছে নেই। সবাই ছুটিতে। নিজেকে ছুটাছুটি করে প্রত্যেকটি জিনিস জোগাড় করতে হয়েছে।

প্রফেসর গ্লাস আমার পাশেই চুরুট হাতে বসে খুব সম্ভব আমাকে খুশি রাখবার জন্যই একের পর এক রসিকতা করছে। রসিকতাগুলোর সাধারণ নাম হচ্ছে ডার্টি জোকস। ভয়াবহ ধরনের অশ্লীল।

বিকেল পাঁচটায় ল্যাব বন্ধ করে বাসায় ফিরবার আগে আগে গ্লাসের কামরায় উঁকি দিলাম। গ্লাস হাসি মুখে বলল, কিছু বলবে হামাদ।

ঃ হ্যাঁ, বলবো। আগেও কয়েকবার বলেছি। আজও বলবো।

ঃ তোমার নামের উচ্চারণের ব্যাপার তো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ উচ্চারণ করতে পারি না বলেই তো একটু এলোমেলো হয়ে যায়। এতে এতো রাগ করবার কী আছে? আমেরিকানদের জিহ্বা শক্ত।

ঃ আমেরিকানদের জিহ্বা মোটেই শক্ত নয়। অনেক কঠিন উচ্চারণ এরা অতি সহজেই করে। তোমরা যখন কোনো ফরাসী রেস্টুরেন্টে যাও তখন খাবারের ফরাসী নামগুলো খুব আগ্রহ করে উচ্চারণ করো না?

গ্লাস গম্ভীর চোখে তাকিয়ে রইলো। কিছু বললো না।

আমি বললাম, এসো আমার সঙ্গে। চেষ্টা করো, বলো হুমায়ূন।

গ্লাস বললো, হেমেন।

আমি বললাম, হলো না, আবার বলো হুমায়ূন। হু-মা-য়ূ-ন।

গ্লাস বললো, মায়ান।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। আমেরিকায় পা দেবার পর থেকে যে জিনিসটি আমাকে পীড়া দিচ্ছে সেটা হচ্ছে শুদ্ধভাবে এরা বিদেশীদের নাম বলতে চায় না। ভেঙে-চুরে এমন করে যে রাগে গা জ্বলে যায়। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির মিজানুল হককে বলে হাকৃ। হাকৃ পারলে হক বলতে অসুবিধা কোথায়? অন্য বিদেশীরা এই ব্যাপারটি কিভাবে নেয় আমি জানি না। আমার অসহ্য বোধ হয়।

হংকংয়ের চাইনীজ ছাত্রদের দেখেছি এ ব্যাপারে খুবই উদার। তারা আমেরিকানদের উচ্চারণ সাহায্য করার জন্য নিজেদের চাইনীজ নাম পাল্টে পড়াশোনার সময়টার জন্যে একটা আমেরিকান নাম নিয়ে নেয়। যার নাম চ্যান ইয়েন সে হয়তো খণ্ডকালীন একটা নাম নিলো, মিঃ ব্রাউন। দীর্ঘ চার বছরের ছাত্রজীবনে সবাই ডাকবে মিঃ ব্রাউন। যদিও তার আসল নাম চ্যান ইয়েন। হংকংয়ের চাইনীজগুলো এই কাজটি কেন করে কে জানে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে দার্শনিকের মতো বলল,—ভুল উচ্চারণে আসল নাম বলার চেয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে নকল নাম বলা ভালো। তাছাড়া নাম আমেরিকানদের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা হচ্ছে ফাজিলের দেশ। নামের মধ্যেও এরা ফাজলামি করে। তাই না?

নাম নিয়ে যে এরা যথেষ্ট ফাজলামি করে সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নেই। এরা পশুর নামে নাম রাখে যেমন, Mr.Fox, Mr. Lion, Mr. Lamb. এরা কীট-পতঙ্গের নামে নাম রাখে যেমন, Mr. Beetle (গুবরে পোকা)। একটা নাম পেয়েছিলাম যার বাংলার মানে—ষাঁড়ের গোবর (Mr. Bull dung Junior)। অবশ্যি বাংলা ভাষাতেও খাদ্য, গেদা নাম রাখা হয়। তবে সেসব নাম নিয়ে আমরা বড়াই করি না। আমেরিকানরা করে। আমি একজন আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্র পেয়েছিলাম সে খুব বড়াই করে বললো—আমার নাম Back Bison (বাইসনের পাছা)।

ধরাকে সরা জ্ঞান করার একটা প্রবণতা আমেরিকানদের আছে। ঢাকা শহরে একবার এক আমেরিকানকে খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছি। গাড়িতে একজন বাঙালী তরুণী এবং দুইজন বাঙালী যুবক। আমি জানি না, তবে আমার বিশ্বাস আমেরিকানটির খালি গায়ে গাড়ি চালানোর যুক্তি বোধহয় এদেশে গরম। আমাদের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতায় এই আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়, এটা তারা জেনেও এই কাজ করবে। ভাবটা এরকম, আমরা কোন কিছুই পরোয়া করি না। এরা যখন আমাদের দেশে আসবে তখন আমাদের আচার-আচরণকে সম্মান করবে এটা আমার বিশ্বাস আশা করবো। তারা যখন তা করবে না তখন মনে করিয়ে দেবো যে তারা যা করছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা প্রায় কখনোই তা করি না। সাদা চামড়া দেখলে এখনো আমাদের হুঁশ থাকে না। যাক পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

আমি খুব যে একজন বিপ্লবী ধরনের ছেলে তা নয়। বড় বড় অন্যায় দেখি কিন্তু তেমন কোনো সাড়াশব্দ করি না। সব সময় মনে হয় প্রতিবাদ অন্যেরা করবে আমার ঝামেলায় যাবার দরকার নেই। তবু বিকৃত উচ্চারণে বিদেশীদের নাম বলাটা

কেন জানি শুরু থেকেই সহ্য হলো না। একটা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম যাতে আমেরিকানরা শুদ্ধ নামে ডাকার একটা চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরের কাগজে চিঠি লিখলাম, আমার যুক্তি আমেরিকানরা ইচ্ছে করে বিদেশীদের ভুল উচ্চারণে ডাকে। উদাহরণ হচ্ছে, শীলা নামটা সঠিক উচ্চারণ না করতে পারার কোনোই কারণ নেই। এর কাছাকাছি নাম তাদের আছে। কিন্তু যেই তারা দেখবে এই নামটা একজন বিদেশীর, অমনি উচ্চারণ করবে—শেইল (Sheila), এর মানে কী?

সাত বছর ছিলাম আমেরিকায়। এই সাত বছরে অনেক চেষ্টা করলাম ওদের দিয়ে শুদ্ধভাবে আমার নামটা বলাতে। পারলাম না। ফল এই হল যে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রটে গেল 'হামাম' নামের এই ছেলের মাথায় খানিকটা গণ্ডগোল আছে। তবে ছেলে ভালো।

বিদেশের পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে আসছি। আমার দেশে ফিরে যাওয়া উপলক্ষে প্রফেসর গ্লাস তার বাড়িতে একটা পার্টি দিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এই পার্টিতে প্রথমবারের মতো সে শুদ্ধ উচ্চারণ করলো। আমার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সুন্দর পরিণতি। আমার ভালো লাগার কথা। আনন্দিত হবার কথা। কেন জানি ভালো লাগলো না।

গ্লাস গাড়িতে করে আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে।

আমি বললাম, এই তো সুন্দর করে তুমি আমার নাম বলতে পারছো। আগে কেন বলতে পারতে না?

গ্লাস খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো, বিদেশীদের আমরা একটু আলাদা করে দেখি। আমরা তাদের রহস্যময়তা ভাঙতে চাই না। তাদের অন্য রকম করে ডাকি। অন্য কিছু না।

অধ্যাপক গ্লাসের কথা কতোটুকু সত্যি আমি জানি না। সে যেভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছে অন্যরাও সেভাবে দেখেছে কিনা তাও জানি না। গ্লাসের কথা আমার ভালই লাগলো। আমি হাসিমুখে বললাম, তুমি আমাকে তোমার মত করেই ডাকো।

বিদায় নিয়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্লাস বললো, হামান, ভালো থেকো এবং আগলি আমেরিকানদের কথা মনে রেখো।